পথের ধুলোর রঙে রঙে

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :
৯ই মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক : আশিস্‌গোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ বিধান সরণি,
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর : অলোকনাথ ভদ্র
দীপালী প্রেস
১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : রাখালদাস মুখোপাধ্যায়

স্বর্গগতা মাতৃদেবী

ও

দিব্যধামবাসী পিতৃদেবের

উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

গল্পভারতী সম্পাদনার সময়ে সাহিত্যপ্রেমিক গল্পভারতী পরিচালক শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের আগ্রহে 'পথের ধুলোর রঙে রঙে' স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছিলাম। পাঠকবর্গের আগ্রহের সবিশেষ পরিচয়ও পেয়েছিলাম। স্মৃতিকথা লেখার সময় অধিকাংশ লেখক লেখিকাই জীবনে যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন তাঁদের কথাই উল্লেখ করে থাকেন। আমার স্মৃতিকথা তাঁদের নিয়েই যাঁরা অতি সাধারণ—যাঁদের কেউ চেনেন না। কিন্তু আমার চলার পথে তাঁরা অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের দান অসামান্য। আমি এ যুগের বিখ্যাত ও অতি পরিচিত মানুষের সংস্পর্শে যে আসি নি তা নয়। তাঁদের নিয়েও কিছু কিছু লিখেছি। পৃথক আর একটি পর্বে তাঁদের কথা প্রকাশের ইচ্ছে আছে।

'পথের ধুলোর রঙে রঙে' প্রকাশকালে আমার অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ 'শংকর নর্মদার' লেখক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা বারংবার মনে আসছে। গ্রন্থখানি লেখার ব্যাপারে তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। পুস্তকাকারে 'পথের ধুলোর রঙে রঙে' প্রকাশ হয়েছে দেখলে তিনি কত খুশীই না হতেন। তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

॥ এক ॥

আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।

প্রতিদিনের আয়ুনদীপ্রবাহ কাল-সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে—তারপর মহাসিন্ধুর অনন্ত-অসীমে লয় পাচ্ছে। মানুষের জীবনের আয়ুর পরিণতির এই রকম একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

কিন্তু এরই মধ্যে প্রতিদিনের নদী-প্রবাহ কূলবর্তী তটভূমিকে কত গড়ে এবং ভাঙে, এই ভাঙাগড়াই নদীর সৃষ্টি।

সুজলা নদী সুফলায় অন্ন বিতরিণী—তৃষ্ণার জল। প্রতিদিনের প্রবাহ তাই একেবারে সব কিছুকে ধুয়ে-মুছে ফেলে না।

নদীকে ঘিরে কত ইতিহাস, কত ইতিকথা, কত স্রোত আর ভাঁটা। স্রোত-স্রোতস্বিনী, খর-প্রবাহিনী—স্রোতের ধার কত! জলের ভার স্রোতে ভারী হয়ে ওঠে না।

আর ভাঁটা নিস্তরঙ্গ—কিন্তু তার একটা গতি আছে। ভাঁটি যেন মন্থরতায় জলভারকে বয়ে নিয়ে চলে শ্লথ উদ্যমে। গতির তীক্ষ্ণতা নেই,—উজানের পথে বাধা-বিপত্তি, ভাঁটা বড্ড বেশী পশ্চাদগামী। তাই বলে কিন্তু স্থিরতায় আবদ্ধ নয়।

জীবনও তাই।

স্রোতের ক্ষিপ্রতা সব জীবনে নেই; কিন্তু ধারা একটা অবশ্যই আছে। গড্ডালিকায় যে জীবন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—সেখানেও ধারা প্রবাহিনী, কখনো কখনো খর-প্রবাহিনী হয়ে বন্যা জাগায়, জীবনের দুকূল ভাসায়। তখন যৌবন জলতরঙ্গের কথা স্মরণে আসে—এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

জীবনের সেই ক্ষণগুলি এক একটা চিহ্নিত মুহূর্ত,—তা প্লাবন আনে। সেই প্লাবনের বেগে ক্ষয় ক্ষতি অনেক; কিন্তু তা থেকেই নব-নব সৃষ্টির উন্মেষ।

সেই উন্মেষের বন্যার রূপ একবার আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। ঘটনাটি সামান্যই, কিন্তু তার রেশ এখনো থেকে থেকে আমার মনে সমুদ্ভাসিত হয়ে যৌবন জলতরঙ্গের ডাক দেয়। আমার জীবন-মন্থরতায় গতির প্লাবন আনে। যে আয়ু দিন দিন গত তারই মধ্যে এক পরমায়ুকে খুঁজে পাই। সে পরমায়ু মুছেও মোছে না। তা না হলে কিশোরকালের কবেকার এক বিগত কথা আজো স্বগত হয়ে স্বাগতম্ ধ্বনিকে জাগিয়ে তোলে কেন?

চব্বিশ পরগণায় বনগাঁ-বারাসাত মহকুমার মধ্যবর্তী একটি গ্রামে জন্ম আমার। শৈশবে পালিত সেই গ্রামের সঙ্গে কিশোর থেকে সম্পর্ক। বার্ধক্যে তেমন কিছু সংস্রব আর এখন নেই; তবুও থেকে থেকে গ্রাম আর শহর জীবন-পরিক্রমায় সে গ্রাম একটি স্বাক্ষর হয়ে বেঁচে আছে আমার জীবনে।

গ্রামের নাম গোবরডাঙ্গা।

গোবরডাঙ্গার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গ্রাম-বাংলার এক বিশিষ্ট পরিচয় আজো বহন করে আসছে। কলকাতা শহর থেকে পূর্বে ছত্রিশ মাইল মাত্র ব্যবধানের পথ। আমরা বাল্যকাল থেকেই কলকাতা শহরের উত্তরাঞ্চলের বসবাসী। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত নই। বছরে শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ, বর্ষায় নিয়মিত দেশের ভট্টাচার্য-পরিবারের বড় বাড়িতে যাই। বড় মনোরম সেই গ্রাম্য পরিবেশ। পিতৃদেব কলকাতার বড়বাজারে সামান্য এক ব্যবসা করেন। পরিমিত আয়। শুনেছি পূর্বে তিনি ইস্টবেঙ্গল রেলওয়ের অডিট ডিপার্টমেন্টের জুনিয়ার কেরানি ছিলেন। গড্ডালিকা জীবন-প্রবাহে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঝাঁপ দিলেন অদৃষ্ট তরঙ্গে।

আমার মাতৃদেবীর পিতা ছিলেন বড়বাজারের এক প্রখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী। অনেকগুলি পুত্র কন্যার জনক আমার পিতৃদেবকে তিনি নিজ ব্যবসায়ে অংশীদার করে টেনে নিয়ে এলেন।

আমার দাদামশায়ের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তিন কন্যার

মধ্যে প্রথমা কন্যা আমার মাতৃদেবী, মধ্যমা আমাদেরই গ্রামে এক ধনাঢ্য পরিবারে বিবাহিতা। তাঁর স্বামী দেশঘরে ব্যবসা করেন—চাল্ মুদিখানার দোকান। তাই ব্যবসায়ী শ্বশুরের মধ্যম জামাতা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা ছিল না। আরো দুশ্চিন্তা ছিল না এই কারণে যে কয়েক বছরের বিবাহিতা-জীবনেও আমার মেজমাসী নিঃসন্তানা।

দাদামশায়ের কনিষ্ঠা কন্যা পরম রূপবতী কিশোরী—তখনো অবিবাহিতা। উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধান চলছে।

উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে কোন রকমে স্বল্প ভাড়ায় দু'খানি ঘর নিয়ে পিতৃদেব স্থায়ী রেলের চাকরি ছেড়ে দাদামশায়ের বড় বাজারের দোকানে এসে ব্যবসায় কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন, কিন্তু আত্মাভিমানী পুরুষ—শ্বশুরের শহরের বড় বাড়িতে কিছুতেই আশ্রয়প্রার্থী হলেন না।

এই ব্যবসায় কাজে আত্মনিয়োগের পরমুহূর্তেই শোচনীয় দৈব দুর্বিপাকে বড়লোক বড়বাজারের ব্যবসায়ী শ্বশুর পরলোক গমন করেন।

বড় জামাই-এর সাহায্যে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শহর-পল্লী শুক্চরের প্রসিদ্ধ ধনী গৃহস্থ পরিবারের শিক্ষিত গ্রাজুয়েট সুদর্শন পুত্রের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের শাশুড়ি-ঠাক্রুণ কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ সাড়ম্বরে দিলেন।

সেই নতুন ছোট জামাই এসে অধিকার করলেন শ্বশুরের দোকান।

আমার পিতৃদেব পড়লেন অকুল পাথারে। স্থায়ী চাকরি ছেড়ে শ্বশুরের চলতি দোকানের অংশীদারের আসন থেকে অদৃষ্ট চক্রে আবার তাঁকে নেমে আসতে হল এক অসহায় অবস্থায়। কিন্তু অদম্য সাহসে আর আত্মনির্ভরতায় তিনি স্বতন্ত্র এক ধনী ব্যবসায়ীর ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে নিজেকে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন।

তবু মধ্যবিত্ত অনটনের আয়। কোনরকমে দিনের অন্ন সংগ্রহ। কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকো এলাকায় দু'খানি স্যাতসেঁতে একতলার

ঘর থেকে আমরা উঠে এলাম বিডন স্ট্রিটের সন্নিকটস্থ ধনী ঘৃত ব্যবসায়ী দেবেন দত্তের সুরম্য গৃহে। দেবেন দত্ত মশায় "বিশ্বেশ্বর"—ঘৃতের মালিক। প্রচুর অর্থবান—আমাদের স্বগ্রামবাসী। গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা গ্রামের ধনী ব্যবসায়ীরা তখন বড়বাজারে এক চেটিয়া ঘী চিনির কার-বারী। দেবেন দত্ত মশায়ের তিন মহলের বাড়ির শেষ মহলে দোতলায় তিনখানি স্বল্পালোকিত ঘরে স্বল্প-ভাড়ায় আমাদের আশ্রয় মিলল।

আমার মা দেবেন দত্ত মশায়ের পত্নীর বামুনদিদি।

সেকালে দ্বিজ ব্রাহ্মণ বিশেষ করে আচার্য ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতি একটি সম্ভ্রমবোধ অপর হিন্দু শ্রেণী সম্প্রদায়ের সংস্কারগত ছিল। তাই 'বামুন দিদি' এক বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্রী। আমার মাতৃদেবীর মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। গৃহ-শিক্ষায় আক্ষরিক শিক্ষাজ্ঞান মাত্র, কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনায় এবং মার্জিত বুদ্ধিবাদে তাঁকে সহজেই দশজনের মধ্যে স্বতন্ত্র একজন বলে চেনা যেত।

পিতৃদেব খুশি—সস্তার ভাড়ায় পরম নির্ভরযোগ্য এমন তিনখানি দোতলার ঘর এত বড় বাড়িতে পাওয়া গেছে। মাতৃদেবীর মন কিন্তু বিপরীত। তাঁর সর্বদাই আশঙ্কা—এমন পরিবেশে ছেলেমেয়ে মানুষ হতে পারে না।

বিশেষ করে তখনকার দিনে নৈতিক পরিবেশের মূল্য ছিল জীবনের মূল ভিত্তি।

রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের এই পল্লী বারবণিতায় ঘেরা। মাত্র তিন চারটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এই কলুষিত পল্লীতে একটা আলাদা স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নশীল। রামবাগানের দত্ত পরিবার একদিকে আর একদিকে বড়বাজারের ঘৃত ব্যবসায়ী দেবেন দত্ত এবং আশেপাশে আরো দু'তিনখানি বাড়ি। মিনার্ভা থিয়েটারে একদিকে 'আত্মদর্শনে'র সুর, কিংবা ডি, এল, রায়ের নাটকের 'আবার তোরা মানুষ হ',—তার পাশে উচ্ছৃঙ্খল স্খলিত কণ্ঠে মাতালের গান—

'প্রেম ফুটেছে নয়তো কি সই চাইলো তোর পানে / বনে কি ফুল ফুটলো লো ফুল দেখি বাগানে।'

আর বারবণিতা কণ্ঠের প্রত্যুত্তর—'নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে / সোহাগ ভরে সুখ-সাগরে হেসে ভেসে এসেছে।'

কিংবা—'যাও যাও কালা এসো না কাছে / তোমার পীরিতে কাজ কি আছে।'

এসব গানের অর্থ আমরা বুঝতাম না। কিন্তু মাতৃদেবী শঙ্কিত হয়ে পিতৃদেবকে বলতেন, 'কি দরকার আমাদের শহরের দোতলার এই তিনখানি ঘরে। বুঝছো না, কচি কচি ছেলে মেয়েদের মনে কি বিষ ঢুকছে ?'

উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিট সংলগ্ন রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের সে পরিবেশ এখন আর নেই। আর এখনকার দিনে কল্পনায়ও করা যায় না—গেটঅলা দু' মহলের বড় তিনতলার বাড়ির পিছনের দিকে দোতলার তিনখানি ঘরে আমরা মাসিক ভাড়া দিতাম মাত্র কুড়ি টাকা করে।

পিতৃদেব মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে বলতেন, 'কোথায় পাবো বলো এত সস্তায় এই নিরুদ্বেগ আশ্রয়। কলকাতা শহর কি সাঙ্ঘাতিক—যেখানে সেখানে কি তোমাদের রেখে থাকা যায় ? এখানেও তো পাশা-পাশি শিক্ষিত ভদ্র পরিবেশ রয়েছে। খানিকটা খোলা-মেলা আব-হাওয়া। সংসারের কাজ সেরে তিনতলার বড় ছাদে গিয়ে বসো ছেলে মেয়েদের নিয়ে। সেখানে বসে ওদের প্রশস্ততার ধ্যান শিখিও।'

ষাটোর্ধ্ব বয়সে এখনো বাল্যস্মৃতির বহু অবক্ষয়ের মধ্যে পিতৃকণ্ঠ নিঃসৃত মহাদর্শনের এই ধ্বনিতরঙ্গটি আমার জীবনে নদীতরঙ্গময়তার ব্যঞ্জনা আনে।

সত্যি, মায়ের আঁচলে চোখ রেখে মায়ের কনিষ্ঠ পুত্র আমি যখন দত্ত বাড়ির সুপ্রশস্ত ছাদে বসে আকাশের ফুটন্ত তারাগুলি এক এক

করে শুনতাম তখন বালক-চিত্তে কী ভাবের সঞ্চার হত জানিনে, তবে বারবণিতা পল্লীর গান ছাপিয়ে অগণন তারকারাশির জ্বলজ্বলে সংখ্যা নির্ণয় তত্ত্বে আত্মহারা হয়ে উঠতাম—একথা স্মরণে আছে।

জীবনে সে এক মহাব্যাপ্তির আহ্বান।

গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য পাড়ার ন্যায়-দর্শনের সুপণ্ডিত পরিবার ভট্টাচার্য বংশ। কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কবে টোল চতুষ্পাঠী খুলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করে অধ্যাপনা করতেন, গুরুরূপে তন্ত্র-মন্ত্র দিতেন, পরবর্তী কালে কিছু যজমান শিষ্য আর দেবোত্তর ভূমির অধিকারী হয়ে ভট্টাচার্য উপাধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সে ইতিহাস সম্যকরূপে আমার জানা নেই।

আমার দেখা ভট্টাচার্য-পরিবারের বড় বাড়ি—বহু সন্তান-সন্ততি, প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজনের কলকণ্ঠ এবং কলহাস্যে মুখরিত। বাড়ির অভিভাবক আমার জ্যেষ্ঠতাত 'বাবু' এবং অভিভাবিকা জ্যাঠাইমা 'বড়মা' নামে সর্বসাধারণে অভিহিত ও পরিচিত।

বাবু এ্যালোপাথিক ডাক্তার।

হার্টের অসুখে মনে সর্বদা ভয়। বাইরের কল ছেড়ে দিয়েছেন। বাড়ির বর্হিভাগে "সাউথ হল ফার্মেসী", আর তৎসংলগ্ন প্রশস্ত একটি বড় ঘরে আড্ডার মজলিশ। সকাল সন্ধ্যায় ডাক্তারখানায় ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লীহা আর যকৃতের রোগীর আগমন।

বাবু অর্থাৎ ডাক্তারবাবু রোগী দেখেন—বিনা পারিশ্রমিকে আর নামমাত্র দামে ওষুধ দেন, তাও ধারে এবং বাকীর পরিমাণই বেশি। এইতেই দিন চলে—দিন চলে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের ভরণ-পোষণের।

বাবু-বড়মা নিঃসন্তান—আমার বড়দাকে পুত্রবৎ মানুষ করছেন। বড়দা এই ভট্টচার্য-বাড়িতেই লালিত-পালিত।

মেজ জ্যাঠামশায় যজমান শিষ্যের কাজে ধর্ম-কর্মের ব্যবসায়ী,

জমিজায়গা দেখেন আর গ্রাম্য-জমিদার ছোট তরফের জমিদারী-সেরেস্তায় আমার পিতৃদেবের খুল্লতাত ভ্রাতা আমাদের ছোটকাকা অতি সামান্য বেতনে তহশীলদারী কাজ করেন। বাড়তি-আয়ের ফুটো-তরীতে মেজ জ্যাঠামশায় এবং ছোট কাকার আয়ের জল গড়িয়ে চুঁইয়ে পড়ে—সংসার-তরণী দৃঢ় মুষ্ঠিতে টেনে নিয়ে যান নির্বিঘ্নে ডাক্তারবাবু।

একান্নবর্তী পরিবার—শুধু আমার দাদা আর মেজ জ্যাঠামশায়ের কন্যা জামাতারা নন, ছোট কাকারও অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা এবং ভট্টাচার্যপাড়ার অনেক দুঃস্থ পরিবার 'বাবু-বড়মা'র স্নেহাশ্রয়ে প্রতিপালিত।

আমার পিতৃদেব শহর কলকাতায় থাকেন আমাদের নিয়ে, কিন্তু দেশের বাড়ির সঙ্গে নাড়ির যোগ। বছরে অন্তত চার-পাঁচ বার করে দেশের যাওয়া এবং কিছুদিন ধরে থাকা।

দেবেন দত্ত মশায়ের দুই ছেলে। বিশ্বনাথ এবং সিদ্ধেশ্বর। আমরা ভাড়াটিয়া হলেও ধনী দত্ত পরিবারের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত। গোবরডাঙ্গার অন্তর্বর্তী খাঁটুরিয়া গ্রাম। খাঁটুরিয়ায় আমার মায়ের পিতৃ-আলয়। মার অনুরোধে বিডন স্ট্রিটস্থ কোম্পানী বাগান (অধুনা রবীন্দ্র কানন) নিকটে শ্যামাচরণ স্কুলে বিশ্বনাথদা আমাদের দু'ভাইকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। বড়দা গোবরডাঙ্গায় বাবুর কাছে এবং মেজদা বর্ধমানে আমাদের ছোটঠাকুরদা বাবার পিতৃব্যের কাছে থেকে পড়াশুনা করেন। প্রত্যেক ছুটিতে আমরা গোবরডাঙ্গায় মিলিত হই।

ডাক্তারবাবুর ডাক্তারখানার মজলিশে সান্ধ্য এবং নৈশ আসর বসে।

আসর নয়, বাসর বলা চলে। গ্রামের এবং শুধু গোবরডাঙ্গা গ্রামের নয় আশপাশের গ্রাম থেকেও আসেন সমস্ত সম্ভ্রান্তজন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদারকাছারির বড় বড় নায়েব-আমলা,

কবিরাজমশায়, গ্রাম্য-ইস্কুলের হেড-মাস্টার, হেড-পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত সব চিকিৎসকের দল্ এবং গ্রাম-মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারবৃন্দ।

আসেন কাশী থেকে ন্যায়-শাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিতবর্গ—থাকেন কিছুদিন। অতিথি হয়ে আসেন—স্বগ্রামের কলকাতা-অধিবাসী তদানীন্তন 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক স্বর্গত শশিভূষণ মুখোপ্যাধ্যায়।

ডাক্তারবাবু পরিহাসরসিক—আড্ডাবাজ। নিয়মিত আড্ডায় হার্টের প্যালপিটেশনে ভুগে থাকতে চান।

ডাক্তারবাবু জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী—জটিল ঠিকুজিকোষ্ঠী গণনায় বিশেষ আগ্রহী। তাঁর হবির মধ্যে জ্যোতিষগণনা এবং সাহিত্য-চর্চা।

কাশীর বেদজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ তাঁর তৎকালীন আর্যাবর্ত, ভারতবর্ষ, বসুমতী, হিতবাদী, জন্মভূমি, অর্চনা প্রভৃতি সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠে 'সাহিত্য-বিশারদ' উপাধিতে তাঁকে বিভূষিত করেন। গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাশে ডাক্তারবাবু গল্প-কবিতাও লিখতেন।

ডাক্তারখানার বৈঠকী-মজলিশে সন্ধ্যা থেকেই ভিড় জমে।

বৈকালিক ভ্রমণ-পর্ব সেরে জলযোগ সমাপন্তে বাবু এসে বসেন বৈঠকখানায়।

নিজে কঠিন সংযমী পুরুষ। নিত্য ভ্রমণ সকাল-বিকালে। পরিমিত আহার, নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া-দাওয়া, সকল কাজকর্ম সারা। এমন নিয়ম মাফিক চলা-ফেরার মানুষ জীবনে অল্প কয়েকজনকেই দেখেছি।

কখনো বাইরে খেতেন না। নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতাম তাঁর বনামে আমরা।

আমার সে কী আনন্দ! জমিদার-বাড়ির পূজোর ভোগ খেতে চলছি—অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারক বাঁড়ুজ্জের ঘোষপুর গ্রামে

নাতির অন্নপ্রাশনে ভূরিভোজে অপ্যায়িত হয়েছি বাবুর বনামে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি হয়ে।

সেকালের এ-রীতি আজ অনাদৃত এবং অপসৃত। কিন্তু আমাদের বাল্যকালে এটি ছিল সামাজিক-প্রথা। সুসজ্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ভূরি-ভোজনের আপ্যায়নে এক বিশেষজনের বনামে অবিশেষ-জনের সম্মানলাভ।

ডাক্তারখানার বৈঠকী-বাসরের কত টুক্‌রো-টুক্‌রো ছবিই না মনে পড়ে, আজ আর তার বর্ণ বিন্যাস নেই। কিন্তু পাতা-ঝরা চৈত্রের ঝড়ো-হাওয়ায় টুপটুপ করে সে পাতা এখনো ঝরে ঝরে পড়ে। পাকা হলুদ রঙে কবেকার বিবর্ণ সবুজ রঙের ছোপ!

ঘোষপুরের অধিবাসী অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারক বাঁড়ুজ্জে বয়সে তখন প্রবীণ—ঘোষপুর থেকে গ্রাম্যনদী যমুনার রেলওয়ে ব্রীজ পার হয়ে নামেন গোবরডাঙ্গায়—সেখান থেকে নিত্য যান গৈপুর গ্রামে। আবার রাত্রে পদব্রজে বাড়ি ফেরা—পাথেয় ঠোঙায় মিষ্টান্ন খাবার।

গৈপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার সুরেশচন্দ্র মিত্র পরম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তখনকার দিনের মেডিকেল কলেজের এল, এম, এস, পাশ করা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। দয়ালু, উচ্চ কায়স্থ বংশ-জাত, সুপণ্ডিত, শুধু চিকিৎসক নন—সমাজসেবী, সাহিত্যানুরাগী এবং আড্ডাবাজ বন্ধু-বৎসল। তাঁর পরম বন্ধু ভট্টাচার্য ডাক্তারের সান্নিধ্যে আসা চাই-ই প্রত্যহ দু'একবার অন্তত।

সন্ধ্যায় ধূপ ধুনো দিয়ে বাসর সাজানো হয় ডাক্তারখানার সান্নিহিত বড় বৈঠকখানা ঘরে। প্রকাণ্ড চারখানি তক্তাপোষে জাজিম বিছানো বিছানা—ওপরে ধবধবে সাদা চাদর-পাতা। ছোট বড় তাকিয়া বালিশের শ্রেণী।

ডাক্তার ভট্টচার্য সভা জাঁকিয়ে বসেন। নিজে ধূমপানে নেশাসক্ত নন, কিন্তু গড়গড়া আর হুঁকো—পাশে টিকে, তামাক। চাকর-বাকর অপেক্ষা বাড়ির ছেলেরাই তামাক সেজে দেয়। পালা করা

থাকত। পড়াশুনা করার ফাঁকে বাড়ির ছেলেরা যাতে নির্দোষ মজলিশী আড্ডার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে, তাই এ ব্যবস্থা।

কলকাতা থেকে গ্রামের বাড়িতে স্কুলের ছুটির অবকাশ পেলে আমি সেই মজলিশে বিশেষভাবে যোগদান করতাম। যোগদান করতাম যেহেতু আমার একটি বিশেষ পাশপোর্ট ছিল। ডাক্তারবাবুর লেখার সংক্রামিত ব্যাধি অল্প বয়সে আমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমার রচনা পাঠ হত মজলিশে।

ভুরভুরে গয়ার তামাকের গন্ধে ধূপ-ধুনার সুবাস এক হয়ে গেছে। দ্বাদশবর্ষীয় বালকের লেখা পদ্য ঃ

এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে দেখি যত যত ভূমি
এই নদী বৃক্ষরাশি পর্বত কন্দর,
ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি পক্ষী উভচর
সর্বত্র সজীব দেখি হে ঈশ্বর তুমি ॥

ডাক্তারবাবু এককালে গান গাইতেন। সিঙ্গেল রীডের বহু পুরাতন বেসুরা একটি হারমোনিয়মের অস্তিত্ব তখনো ডাক্তারখানা ঘরের বৈঠকখানায় থাকত। সঙ্গীতে বাল্যকালে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিন্তু পিতৃদেবের কড়া তিরস্কার ছিল, 'পড়াশুনো ছেড়ে এবার মথুর সাহার যাত্রাপার্টিতে নাম লেখাও।' তাই সঙ্গীতানুশীলনে বিশেষভাবে অগ্রসর হতে পারিনি।

ডাক্তারবাবুর উৎসাহ ছিল নেপথ্যে। দেশে গেলে তাঁর সান্ধ্য-মজলিশে প্রায়ই গান শোনানোর আমন্ত্রন লাভ করতাম।

একদিনের কথা বলি।

রবীন্দ্রনাথের গান তখন আমাদের বালক-মনে সবেমাত্র অনুপ্রবেশ করেছে। রবীন্দ্র-সুরের খাটি ধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটেনি। যেমন-তেমন করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমাদের বাল্যকালে গাওয়া চলত।

আজ তা নিষিদ্ধ। রবীন্দ্র-ঘরোয়ানার সম্যক অনুশীলন এখন ঘরে ঘরে। কিন্তু আমরা তার ধার ধারতাম না।

কচি গলায় বেসুরো সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়মের রীড টিপে ভট্টাচার্যবাড়ির ডাক্তারখানার মজলিশে সত্তশেখা একখানা গান গেয়েছিলাম—

'আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো॥'

গান শেষ হলে প্রশংসার সঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গধ্বনি কানে এলো।

সেদিনের বাসরে ছিলেন গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্যপাড়ার ঘোষাল মশায়। তিনি আমাদের সম্পর্কিতজন। হাঁক-ডাকের মানুষ। সঙ্গীতজ্ঞ, সমাজ-নীতিজ্ঞ, শিকারী এবং জমিদার সেরাস্তার জাঁদরেল কর্মচারি। শ্বশুরালয়ের সম্পত্তির অধিকারী। তাঁর দাপটে শুধু ভট্টাচার্যপাড়া নয় সমস্ত গ্রাম পল্লীর অধিবাসী তটস্থ।

ডাক্তারবাবু সম্পর্কে মামাশ্বশুর—আর শ্রদ্ধেয়জন। অতএব ঘোষালমশায় তাঁকে সম্ভ্রমের চোখেই দেখতেন এবং মাঝে মধ্যে ডাক্তারখানার বৈঠকী-মজলিশে এসে সমাজ-সংস্কারের ধ্বনি তুলতেন।

ঘোষাল মশায় সম্পর্কে আমার দাদাবাবু। আমাকে প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত সুনজরে দেখতেন। কিন্তু সেদিনের গান তাঁকে বিচলিত করে তুলল। বিরূপ সমালোচনার ক্ষুরধারায় গানের সুর এবং বাণীকে তিনি কচুকাটা করে ছাড়লেন।

'আলো আবার গান করবে কেমন করে হে! আলো কি শরীরী জীব—যে গলা খুলে গান গাইবে? এমন সব গান আর গেওনা ভায়া—গানের জাত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোমাদের এইসব ন্যাকামী আর ছেলে-ভুলনো ছড়ায়।'

ডাক্তার মিত্র জ্যাঠামশায় প্রতিবাদের সুর তুলছিলেন, কিন্তু সত্ত-সমরের আশঙ্কায় ডাক্তারবাবু চোখ টিপে ইশারায় তাঁকে নিরস্ত করলেন।

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারক বাঁড়ুজ্জে তখন বাজার থেকে তিনকড়ি ময়রার দোকান হতে কেনা এক ঠোঙা ছানার মুড়কি থেকে আমাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়িত করলেন—'বেশ গেয়েছো হে নাতি ভায়া—আরো গান শুনিও।'

মর্মাহত বালক সেদিন ছানার মুড়কির বদলেও কিন্তু শ্লেষ-আঘাতের হুল ফুটোনোর জ্বালা ভুলতে পারে নি।

ঘোষাল দাদাবাবু তখন দরাজ গলায় গান ধরেছেন—

'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী'।

কিন্তু সে যমুনা কোথায় ? আমার চোখে- দেখা আমার গ্রামের শাখা-নদীর প্রবাহ সবুজ দামে আবদ্ধ। তার তো বিশালতা নেই। আর আশেপাশে শ্যাম এবং রাই বিনোদিনীর চিহ্নই বা কোথায় ?

কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম কই ?

মনের বেদনা কিন্তু তবু গেল না।

না—ছানার মুড়কি খেয়েও নয়, ডাক্তার মিত্তির জ্যাঠামশায়ের সস্নেহ পিঠ চাপড়ানিতেও নয়। মনের জ্বালায় সেদিন রাত্রেই জবাব লিখেছিলাম বালক মনের স্বতস্ফূর্ত পদ্যের ছন্দে ব্যঙ্গের লেখনীতে—

ঘোষাল বিশাল নয় অতি ক্ষুদ্র চেতা
পেঁকো জলে উলম্ফন ভেকের নৃত্যতা।

গায়ের জ্বালা কিছুটা মিটলো।

পরের দিন সকাল বেলা। ঘোষাল দাদাবাবু আমাকে তাঁর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে যমুনা নদীর ধার ধরে বেড়িয়ে নিয়ে ফিরবার পথে বাজারের তিনকড়ি ময়রার দোকান থেকে টাটকা তৈরী গাওয়া-ঘিয়ের জিলিপি আর কাঁচাগোল্লা সন্দেশ যৎপরোনাস্তি খাইয়ে ছিলেন, আর এক-জোড়া রঙিন চশমা উপঢৌকন দিয়েছিলেন—কলকাতা থেকে আনানো সান গ্লাস।

কিছুটা ক্রোধ-প্রশমিত চিত্তে তখন মনে হয়েছিল, 'আহা', এতটা

সুতীব্র আক্রমণ ঘোষালদাদাবাবুকে না করলেই হোত! অবোধ রবীন্দ্র-আলোহীন অন্ধ মানুষ,—ঈশ্বর, ওঁর চোখে আলো দাও!'

তাই বাড়ি ফিরে অনেক মোলায়েম করে লঘুছন্দে লিখলাম—

ঘোষাল মশাল নয় জানে না জ্বলিতে
তবু আহা জ্বলে আলো সলিতার চিতে॥

ব্যঙ্গ কবিতার এ-হেন পংক্তিগুলি একান্তই আমার নিজস্ব সম্পত্তি।

কিন্তু সম্পত্তি-হরণের চোরের অভাব নেই—এমন কি নিজের ঘরেই সেই চোরের অধিবাস। আমার এক পিস্তুতো ভাই পাঁচুদা, তিনিই চৌর্যবৃত্তি করে ঘোষাল দাদাবাবুর হাতে আমার ব্যঙ্গ কবিতার লেখার চিরকুট দু'টি ন্যস্ত করেন আর পরিহাসরসিক ঘোষালদাদাবাবু পরবর্তী ডাক্তারখানার মজলিশে সর্বসমক্ষে তা পাঠ করে আমাকে কাব্যশ্রী-বিভূষণে ভূষিত করেন কাব্যকুশল রূপে।

এ-যমুনা সেই যমুনা নয় যেখানে যমুনা প্রবাহিণী, যেখানে বিশাল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি, কিংবা—যেখানে বংশীধারী রাসবিহারী বামেতে রাই বিনোদিনী।

তবু এ-যমুনারও রূপতরঙ্গে আমরা বাল্যকালে বিমোহিত হতাম।

নদীর সঙ্গে এই আমার জীবনের প্রথম যোগ।

নন্দদিদি আমাদের ভট্টাচায্যি পাড়ার মেয়ে। বয়স তখন আমার দশ এগার বছর। নন্দ দিদির তের।

তের বছরের দুলালী কুমারী মেয়ে যমুনার জলে সাঁতার কাটে—স্নান সেরে বড় পিতলের ঘড়া করে জল নিয়ে বটতলায় বুড়ো শিবঠাকুরের মাথায় জল দিয়ে ঘরে ফেরে।

একদিন নন্দদিদির সঙ্গে যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলাম। নন্দদিদি আমাকে সাঁতার শেখাচ্ছিল। হঠাৎ ঘাটের সিঁড়িতে কাকে যেন দেখে নন্দদিদি বলে উঠল—'আ মরণ। চল, আর সাঁতার কেটে দরকার নেই—উঠে পড়ি।'

'কেন নন্দদি?'

'দেখছিস্ নে, লম্বোদরের উদয়।'

'লম্বোদর?'

'লম্বা উদর নয় রে,—লম্বা অবয়ব। অবয়ব মানে জানিস্?'

'হ্যাঁ, লম্বা শরীর।'

নন্দদি আমার কথায় পরিহাস করে বলল, 'তালপাতার সিপাই,—তবু যদি হাড়ে মাসে কিছু থাকত। চোখ দু'টোয় শুধু হ্যাংলার আগুন।'

'তাতে তোমার কী?'

আমার কথায় নন্দদি বলল, 'তুই বুঝবি নে। তুই ছেলে মানুষ। চল বাড়ি যাই।'

ঘাটে উঠবার পথে সিক্ত বসন আগাগোড়া শরীরে ঢেকে নিয়ে ঘড়ায় জল ভরে পরোক্ষে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করলে নন্দদি, 'ঘাট থেকে সরে না দাঁড়ালে চেঁচিয়ে লোকজন জড় করব, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।'

লম্বোদর লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

আমরাও চললাম পিছে পিছে।

বুড়ো শিবতলায় এসে কিছুটা বিরতি। নন্দদি শিবের মাথায় জল ঢালবেন।

আমার মাথায় কেমন দুর্বুদ্ধির উদয় হল হঠাৎই। লম্বোদর তখন আমাদের খানিক তফাতে। হঠাৎ তাঁকে উদ্দেশ করে ছুঁড়ে দিলাম শহরের ইস্কুলে পড়া সদ্য জ্ঞাত ইংরাজি কয়েকটি শব্দ—

'God made a tall man।'

আর যাই কোথায়? লম্বোদর লম্বা লম্বা ঠ্যাং মেলে আমার দিকে সবেগে ধাবিত—আমিও পড়ি মরি করে দে ছুট! দে ছুট! জীবনে কখনো সেরকম বেগে ছুটেছি কিনা স্মরণ নেই।

বুড়ো শিবতলা পেরিয়ে ষষ্টিতলা—সেখান থেকে যমুনার ধারে

ধারে সাবেক কালের পড়ো গুড়ের আর দিশি-চিনির কারখানার অলি গলি ঘুরে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে পৌঁচেছিলাম। মনে ভয়, প্রবল আশঙ্কার কাঁপন—লম্বোদর যদি বাড়ি এসে পড়ে!

না, আসেনি।

লম্বোদরকে দীর্ঘকাল আর দেখিওনি আমাদের গ্রামের ত্রিসীমানায়।

যেদিন দেখলাম -সেদিনের কথা আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে।

বয়েস তখন বালকত্ব পেরিয়ে কৈশোর ডিঙিয়ে যৌবনকে ছুঁই ছুঁই করছে। আমি তখন স্বগ্রামেই ছিলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে কিছুদিন দেশের বাড়িতে আছি। ছোটকাকার সঙ্গে পূজো আচ্চায় তন্ত্রধারগিরি করি—পৈত্রিক জমি-জমা তদারকে গিয়ে সত্যি-কারের গ্রাম দেখি।

ছোটকাকা বলেন—'গাঁয়েই থাক্। জীবন এখানেই। তোরা সব লেখা পড়া শিখে দেশ গ্রাম ছাড়লে দেশ বাঁচবে কাদের নিয়ে?'

প্রজারা আশ্বাস দেয়, 'কিছু করবার লাগবে নি ছোট ঠাউর। মোক্তারি কর আমাদের এই বারাসাত কোর্টে। জমিজমা আছে, খাবানি দাবানি, ভাবনাটা কিসের। আর মামলা মোকদ্দমা—তাতো পাবাই।'

মনে পড়ে রাজু মোক্তারের কথা। মোক্তারদের প্রতি বঙ্গললনার কিছুমাত্র প্রেমানুরাগ নেই—তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়েছি রবীন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুলে।'

কিন্তু সে কথা থাক্।

সেদিন অমাবস্যার রাত্রি। রাত প্রায় ন'টা। ডাক্তার মিত্তির জ্যাঠামশায় এলেন—শুষ্কমুখ। টর্চের আলোর বোতাম টিপে নামলেন গরুর গাড়ি থেকে।

বৈঠকখানা-আসরের শেষ আগন্তুক তিনি। চোখ দু'টি তাঁর অশ্রু

ভারাক্রান্ত। আর্তকণ্ঠে বললেন, 'পারলাম না সুরীন, পারলাম না বাঁচাতে। ইরেমসিয়া রোগ। ছেলেটা বাঁচল, নন্দ বাঁচল না।'

'নন্দ বাঁচল না'—হঠাৎ যেন চাবুক খেলাম।

ছুটলাম নন্দদির বাপের বাড়ি। অন্ধকারে মিট্‌মিটে আলোয় নন্দদির মৃত ফ্যাকাশে মুখ—

আহা কী করুণ!

তার চেয়েও করুণ দৃশ্য নন্দদির স্বামীকে ঘিরে। লম্বোদর—অর্থাৎ সেই 'গড মেড এ টল ম্যান।' বিশীর্ণ মুখে দাড়ি গোঁফ—চোখ দু'টি কেবল জ্বলজ্বলে। অনেকে লম্বোদরকে ঘিরে রেখেছে।

'না, না, আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও তোমরা। নন্দ আমাকে ডাকছে।'

ভেবেছিলাম,—বুজরুকি। শোকের নামে আদিখ্যেতা। আবার আসছে বছরেই যমুনাপুলিনে শ্যামের বাঁশি বাজবে। জলকেলি পরিহারান্তে আবার কোন গ্রাম্যরাধা লম্বোদর কৃষ্ণের প্রণয়-লীলায় সংসার-ঘর বাঁধবে।

কিন্তু চিরাচরিত রীতিরও ব্যতিক্রম আছে বৈকি!

তা না হলে লম্বোদর হঠাৎ বা যমুনার জলে ঝাঁপ দেবে কেন? যে যমুনা দামবদ্ধ, পরিকীর্ণ যার স্রোতাবেগ—সহসা সেই যমুনায় বান ডাকবেই বা কেন?

গ্রাম্য-উপনদীর সেই একদা ভয়ঙ্কর বানের সাক্ষী আমি নিজে।

তখন বয়েস আমার বালকত্ব পার হয়ে গেছে। কৈশোরও অতিক্রান্ত। স্কুলের শিক্ষার গণ্ডিও অতিক্রম করেছি। কাব্য এবং সাহিত্যের সংক্রামিত ব্যাধি আমাকে ভালো করেই ছুঁয়েছে।

দেশ থেকে বড়মা চিঠি লিখেছেন—'একবার দেশে আয়। যমুনার বান ডেকেছে। বুড়ো শিবতলা পেরিয়ে ঠাকুরুণ ঘাট ভাসিয়ে বানের জল ভট্টাচায্যিপাড়ার মুখোমুখি।'

দেশে গিয়ে বানের মুখোমুখি হতে প্রথমেই দুঃসংবাদ পেলাম—

লম্বোদর বানের তোড়ে আত্মবিসর্জন দিয়েছে আজ তিনদিন—তেরাত্তির হয়ে গেল এখনো লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়। নন্দর মৃত্যুর পর থেকেই রোজ সকাল সন্ধ্যে রাত্তির লম্বোদর যেত উদাসী চিত্ত নিয়ে বুড়ো শিবতলার ঘাটে। বান আসার প্রথম দিনেও তাকে নিরস্ত করা যায় নি।—'আহা, নন্দর শোকেই প্রাণ বিসর্জন দিলে ছেলেটা।'

তিনদিন পরে যমুনানদীর মাঠকুমড়ার ঘাটের কাছে লাশের সন্ধান মিলল। সেই লম্বাকৃতির লম্বোদর! পচে ঢোল হয়ে গেছে শরীর।

কালা কুণ্ডুর শ্মশানঘাটে জ্বলন্ত চিতায় দেখলাম—লম্বোদরকে। মুখ দিয়ে সত্যি সত্যিই এবার বেরিয়ে এল—'গড মেড এ্য টল ম্যান!

॥ দুই ॥

শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের কথা আমার মনে পড়ে।

উগ্র তেজস্বী নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ—বিবাহ করে ঘরসংসার যাপনে বীতস্পৃহ। কেন যে ভীষ্মের পণে সে যুগে বিবাহ করলেন না, আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন এবং কঠোর কঠিন কুমারজীবন অবলম্বন করে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ইহধাম থেকে পরিণত বয়সে বিদায় নিলেন তার সম্যক ইতিহাস আমাদের কারুরই জানা নেই। গোবরডাঙ্গা থেকে কিছু দূরে ভাণ্ডারকোলা গ্রামে এক দরিদ্র নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-পরিবারে শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের জন্ম। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ছেলেবেলা থেকেই পিতৃদেবকে তাঁকে শিরো-মণিদা বলে সম্ভাষণ করতে শুনেছি। আর বাল্যকাল থেকেই দেখেছি গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য পাড়ার ভট্টাচার্য পরিবারেরই একজন হয়ে আছেন।

কিন্তু শিরোমণি নাম কেন?

প্রথমে তাঁর আসল নামের সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় ছিল

না। জন্মাবধি তাঁকে দেখছি। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শিরোমণি জ্যাঠামশায় বলে ডাকতে শিখেছি। তাঁর নিজস্ব বংশের অপরাপর সকল পুরুষই কৃতী, শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্তজন। তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশে বসবাসকারী। শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের পিতৃদেব পরলোকগমন করলে তাঁর আর দুই সন্তান উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদে চলে যান। এলাহাবাদে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ধনাঢ্য পরিবার শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের পিতার মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁদেরই আহ্বানে পিতৃহীন দুই তরুণ যুবক এলাহাবাদে চলে গেলেন এবং সেখানে শিক্ষাব্রতীর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের বড় ভাই বিবাহ করেছিলেন—তাঁর দুই পুত্র। এখন তাঁরা বয়োবৃদ্ধ। সরকারী কাজে উচ্চবৃত্তি নিয়ে মানুষের মতন মানুষ হয়ে লক্ষ্ণৌতে মান মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সোনার সংসার সাজিয়ে বাড়ি-গাড়িতে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে নামকরা বিশিষ্টজন।

শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের মধ্যম ভ্রাতা আমাদের যতীন জ্যাঠা-মশায়। তাঁকে চোখে দেখেছি—এলাহাবাদ জুবিলি ইস্কুলের খ্যাত-নামা শিক্ষক। সংস্কৃতিবান আদর্শপরায়ণ ইংরেজি-শিক্ষায় সুপণ্ডিত মাস্টার মশাই—এলাহাবাদের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উচ্চ রাজকর্মচারিবৃন্দ থেকে শিক্ষক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী এবং কেরানি চাকুরীজীবী—সকলেরই তিনি প্রিয় মাস্টারমশাই। তিনিও কী কারণে জানি নে দারপরিগ্রহ করেন নি।

দুই ভাই এবং বড় ভাই-এর দুই ছেলের অনেক আন্তরিক আহ্বান সত্ত্বেও শিরোমণি জ্যাঠামশায় কিন্তু এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ গেলেন না—এমন কী সে দেশে বেড়াতেও কখনো যান নি।

পরিধানে একখানি মাত্র বস্ত্র এবং গাত্রবাস উড়নি সম্বল করে ভট্টাচার্য-চটি পায়ে তরুণ কুমার ব্রাহ্মণ শিরোমণি জ্যাঠামশায় তাঁর সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তারবাবুর আশ্রয়ে ভট্টাচার্যপরিবারের বড়-বাড়ির চিলেকোঠায় একখানি ঘরে আশ্রিতজন হয়ে এলেন। কিন্তু

তখনো তিনি শিরোমণি নামে খ্যাত নন। সে আমার জন্মগ্রহণ করার পূর্বেকার কাহিনী।

বাবু অর্থাৎ আমার আপন জ্যেষ্ঠতাত তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। শুনেছি তিনি সংস্কৃত টোলে আদ্য-মধ্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে প্রকৃত সংস্কৃতজ্ঞ তা আমরা অনুধাবন করতাম যখন বাল্যকালে আমাদের সংস্কৃত-স্তোত্র মুখস্থ করাতেন সুললিত কণ্ঠব্যঞ্জনায়। প্রাতঃকালে নদীতে স্নান সেরে তিনি সূর্য-প্রণাম সেরে উদাত্তকণ্ঠে সূর্যের ধ্যান করতেন—

'রক্তাম্বুজাসন অশেষ গুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি।'

আমাদের গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য-ভবনে নারায়ণশিলা প্রত্যহ পূজিত হতেন। শিরোমণি জ্যাঠামশায় সুর করে পূজা মন্ত্র আবৃত্তি করতেন—

'গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুং ব্রহ্মাদৈঃ পরিপূজিতম্॥'

আমাদের শেখাতেন কালীস্তোত্র—

'মেঘাঘীং বিগতাম্বরাং শবশিরারূঢ়াং ত্রিনেত্রাংপরাং।
কর্ণালম্বিত-বাণযুগ্ম-ভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মলিনীং॥'

সংস্কৃত অং-বং শব্দধ্বনি আমাদের কর্ণে কতখানি সুধাবর্ষণ করত তা স্মরণ করতে পারিনে, কিন্তু নিত্য পূজার নৈবেদ্য এবং ভোগ আমাদের রসনা পরিতৃপ্ত করত। আমরা তাই শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলাম।

অনেক রকমের বাতিক ছিল শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের। দু' একটার কথা বলি।

সকালে স্নান সেরে সূর্য-প্রণাম করে বালকভোজ করাতেন—চিনির মুড়কি বাতাসা কখনো সখনো রস-মুণ্ডি। শুধু পাড়ার

কয়েকটি ছেলেমেয়েদের খাইয়েই তিনি পরিতৃপ্ত হতেন না। এরপর দেখতাম—চিনির মুড়কি, বাতাসা রাখতেন তাঁর ঘরের চত্বরে। অসংখ্য পিপীলিকা সার বেঁধে এসে তা মুখে নিয়ে সার বেঁধে চলে যেত।

বাড়ির গৃহিণী বড়মা তিরস্কার করতেন মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় দেবরটিকে,—'আ মরণ, ড্যাকরার বুদ্ধি দেখ একবার। ঘরভর্তি পিঁপড়ে ছিঁড়ে খাবে না?'

মৃদু হেসে শিরোমণি জ্যাঠামশায় জবাব দিতেন—'বড় বৌঠান, ওরাও তো কৃষ্ণের জীব বটে।'

'বদ্ধ পাগল'—বলে বড়মা হেসে চলে যেতেন।

কিন্তু আশ্চর্য, আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের তক্তোপোষের শয্যায় পিঁপড়ের কোন উৎপাত ছিল না।

শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের অকৃপণ স্নেহের অধিকারী হয়েছিলাম একদিকে যেমন তেমন একদিন অপরপক্ষে তাঁর শাসনের নিষ্করুণ আঘাতদণ্ডেও দণ্ডিত হলাম মির্থ্যা গুজব রটানোর জন্যে।

আমাদের গ্রামনিবাসী আমার বাল্যবন্ধু প্রতিবেশী কালিচরণ এসে সভয়ে বললে, 'জানিস, সরকার পাড়ায় কলেরা লেগেছে।'

আমাদের বাল্য এবং কৈশোরকালে গ্রাম-বাংলায় কলেরার সংক্রমণে ভয়াবহ মৃত্যু দেখা যেত।

আমার অপরাধ সে কথা আমি পরিবারস্থ সকলের কাছে প্রচার করেছিলাম—আর যাই কোথায়!

শিরোমণি জ্যাঠামশায় তা শুনে সবেগে তেড়ে এলেন, 'মিথ্যাচার! মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে তুমি মজা দেখছ? কোথায় শুনেছ এ কথা?'

সভয়ে বললাম, 'আজ্ঞে, কালিচরণের কাছে।'

'ডাকো পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদীকে।'

কালিচরণ এসে জানালে—'হ্যাঁ, সত্যিই তো!'

'সত্যিই তো! আবার মিথ্যা কথা উচ্চারণ করছ? সরকার-পাড়ার কোন বাড়িতে কলেরা হয়েছে?'

'কালিচরণের অবস্থা কাহিল। আমতা আমতা করে সভয়ে বললে, 'আজ্ঞে।'

'আজ্ঞে? সেই কথামালার বাঘ আসিয়াছে। রাখাল সেজেছে? আমি এইমাত্র সরকার পাড়া থেকে আসছি। সর্বৈব মিথ্যাভাষণ।'

অতএব শাস্তি পেতে হল। কালিচরণ আর আমি—দুই মিথ্যাচারী। একজনের হাতে দু'খানি ইঁট আর একজনের হাতে একখানি ইট এবং সেই অবস্থায় জানু পেতে বসা। সে শাস্তির কথা আজো আমার মনে আছে। মনে আছে, তারপর মিষ্টান্নদানে পরিতুষ্ট করে আমাদের দু'জনকেই নীতি-উপদেশ দান করেছিলেন—'কদাচ মিথ্যা কহিবে না, মিথ্যা গুজব রটাইবে না। নিজ চক্ষে না দেখিয়া পরের মুখে ঝাল খাইবে না'—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের আসল নামের সন্ধান পেলাম তাঁর নিজের কণ্ঠে উচ্চারিত আত্মপরিচয়-বিবৃতি থেকে।

মিথ্যা রটানোর লঘুপাপে আমরা দু'টি কিশোর বালক যে গুরুদণ্ড লাভ করেছিলাম তা ডাক্তারবাবুর কর্ণগোচর হয়েছিল।

স্নেহময়ী বড়মা চটেই আগুন—'শিরোমণি ঠাকুরপোকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। ছেলেমানুষ ওরা, কোথায় শুনেছে যে কথা তাই বলেছে মাত্র। তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হল যে কচি দু'টি ছেলেকে হাতে থান ইঁট দিয়ে উঠোনে নীল ডাউন করিয়েরাখা!'

স্বামীকে এ নিয়ে শিরোমণি ঠাকুরপোকে ভর্ৎসনা করার জন্যে তিনি রীতিমত সোরগোল তুললেন।

ডাক্তারবাবু শুনে শুধু নীরব রইলেন। মুখে কিছু আর বললেন না।

বড়মা গজগজ করতে করতে মন্তব্য করলেন, 'তোমার আস্কারা

পেয়েই ওর পাগলামি দিন দিন বেড়ে চলেছে—রসো, আমিই ওকে জব্দ করছি।'

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

ডাক্তারখানার সান্ধ্য-মজলিসে সেদিনের আসর রীতিমত জমে উঠেছে। আলোচনা চলছিল দেশের পলিটিক্স্ নিয়ে। পরাধীন দেশে ইংরেজশাসনের অত্যাচার অবিচার নিয়ে নানা কঠোর মন্তব্য। 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় গড়গড়ার নলটি দুই ঠোঁটে চেপে ধরে একটি বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের ওজস্বিনী স্বদেশী বক্তৃতা শুনছিলেন। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারক বাঁড়ুজ্জে ছানার মুড়কি চিবুচ্ছিলেন। গোবরডাঙ্গা হাই স্কুলের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হেডমাস্টার হেমশঙ্করবাবু থেকে থেকে শিরোমণিমশায়কে নিরস্ত হতে উপদেশ দিচ্ছিলেন, 'শিরোমণি মশাই, আর এগুবেন না। সীডিশাস হয়ে যাচ্ছে আপনার বক্তৃতা।'

শিরোমণি জ্যাঠামশায় কিন্তু থামলেন না। কম্বুকণ্ঠে বলে চলেছেন, 'স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের ভালোমন্দ আমরা নিজেরাই বুঝবো। উড়ে এসে জুড়ে বসা যে জাত আমাদের পদদলিত করে রেখেছে, আমাদের সুজলাং সুফলাং মাতৃভূমিকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছে—শাসনের নামে অত্যাচারের শকট চালিয়ে আমাদের ন্যায্য অধিকারকে—'

'স্টপ!'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল যেন। শিরোমণি মশায়ের আঘাতই সবচেয়ে বেশি। একজন তরুণ যুবক খাঁকির প্যান্ট সার্ট পরে বৈঠকে প্রবেশ করে বজ্রকণ্ঠে বক্তাকে প্রশ্ন করলেন, 'হোয়াট্‌স ইয়োর নেম।'

সিংহকণ্ঠে তখন ছাগের আর্ত রব। কাঁপা কাঁপা গলায় শিরোমণিমশায় উত্তর দিলেন, 'আই অ্যাম ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'শিরোমণি তবে কে?'

'আজ্ঞে আমিই!'

'আপনার ছদ্মনাম?'

'না, সংস্কৃতে আদ্য-মধ্য, তাই দাদা আমাকে ওই নামে অভিহিত করেন।'

'ইউ আর এ্যারেস্টেড।'

'এ্যারেস্টেড?'

'হ্যাঁ। সরকার খবর পেয়েছেন যে আপনি রাজদ্রোহী এক বিপ্লবী দলের নেতা। আত্মগোপন করে এখানে আছেন।'

'আজ্ঞে, আজ্ঞে, কী বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। মহামান্য ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা উচ্ছেদে আপনি সিডিশাস বক্তৃতা দিয়ে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের উত্তেজিত করছেন। গ্রামে গ্রামে বিপ্লববহ্নি জ্বালাচ্ছেন।'

গড়গড়ার নল ঠোঁট থেকে নামিয়ে রেখে 'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কে?'

'আমি। আমি বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগের একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেকটর।'

শিরোমণি জ্যাঠামশায় তখন ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। আমরাও ভীত হয়ে পড়েছি।

'ইউ আর এ্যারেস্টেড।'

এ্যারেস্টেড? না না—অতখানি কঠিন শাস্তি শিরোমণি জ্যাঠা-মশায়ের পাওয়া উচিত নয়।

আমার কিশোর মন কেঁদে উঠল—যদিও অহেতুক মিথ্যাভাষণের জন্যে এই দু'দিন আগেই শিরোমণি জ্যাঠামশায় কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছি আমি।

কিন্তু কী আশ্চর্য! শিরোমণি জ্যাঠামশায় রাজভয়ে ভীত হয়ে এ করলেন কী?

বৈঠকখানা ঘরের একদিকের দেয়ালে ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি ছবি টাঙ্গানো ছিল। শিরোমণি জ্যাঠামশায় করজোড়ে সেই ছবির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন। 'মহারাণী কুইন ভিক্‌টোরিয়া আমার মা। আমি তাঁর সন্তান-সেবক। আমি দেশদ্রোহী বিপ্লবী নই।'

অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটও আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করে আগন্তুক যুবককে বললেন, 'ইন্দুভূষণ যথার্থ কথাই বলেছে।'

'দৈনিক বসুমতী' সম্পাদকও এ-কথায় সায় দিলেন।

'তাহলে আমাদের ইনফরমেশন ভুল বলছেন? যাই হোক—আই অনার বোথ অফ য়্যু—বঙ্গ সরকারের আই. জি. ডিপার্টমেণ্টের ইন্‌স্‌পেকটার তারক বাঁড়ুজ্জে এবং শশিভূষণ মুখুজ্জের দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টি মেলে মন্তব্য করলেন। পরক্ষণেই আবার শিরোমণি জ্যাঠা-মশায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'তাহলেও ইন্দুবাবু ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবেন। যেখানে-সেখানে স্বদেশী বক্তৃতা করে নিজের বিপদ টেনে আনবেন না। য়্যু আর রিলিজড।'

'রিলিজড!'—শিরোমণি জ্যাঠামশায়ের মুক্তিতে কিন্তু আনন্দই পেলাম। সেদিনই জানলাম শিরোমণি মশায়ের আসল পরিচয়—তিনি ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—তাই ডাক্তারবাবু কর্তৃক শিরোমণি উপাধি প্রাপ্ত।

মুক্তি লাভ করে ইন্দুভূষণ নিমিষে কোথায় যেন অন্তর্হিত হলেন। সভা ভঙ্গ হল; আর আই. জি. বিভাগের পুলিস ইন্‌স্‌পেক্‌টরও চলে গেলেন।

বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মহিলা-মহলে চাপা হাসির গুঞ্জন শুনলাম। ব্যাপারটা শিরোমণি ঠাকুরকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত। আসলে পুলিশবেশধারী যুবক বড়মারই এক দূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র—কলকাতায় পুলিশ এক্‌সাইজ ডিপার্ট-মেণ্টের একজন জুনিয়ার কর্মচারী। কি এক কাজে এসে পিসিমার

সঙ্গে দেখা করার মানসেই আমাদের বাড়িতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। বড়মার বুদ্ধিতেই বাবু তাঁকে এই অভিনয়-মঞ্চে নামান।

অতঃপর খুব সতর্ক গোপনতার সঙ্গেই এ-ঘটনাটিকে চেপে রাখা হল যাতে শিরোমণি ঠাকুর কোনক্রমেই এ বিষয় জানতে না পারেন।

শিরোমণি জ্যাঠামশায় অধোবদনে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলেন। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলেন বাবু—'শিরোমণি, পুলিশের ভয়ে নিজেকে অতখানি খাটো না করলেও পারতে। দেশের জন্যে জেলে গেলে তোমার মর্যাদা তো আরো বাড়তো!'

ডাক্তারবাবুর এ-উক্তি যেন আমারই মনের কথার প্রতিধ্বনি।

'কীর্তির্যস্য স জীবতি।'

তেমন কিন্তু কীর্তিধর পুরুষ শিরোমণি জ্যাঠামশায় নন, অন্তত বৃহত্তর সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনের ক্ষেত্রে; কিন্তু তবুও তাঁর পরলোকগমনের পর আজো গোবরডাঙ্গার প্রবীণ এবং বৃদ্ধ জনসমাজে শিরোমণি অর্থাৎ ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিস্মরণের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়নি। সেদিনও গোবরডাঙ্গা গার্লস হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে গিয়ে শিরোমণি পণ্ডিতের নাম শুনলাম।

ভট্টাচার্যপাড়ায় অবস্থিত গোবরডাঙ্গা মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় এখন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এর আদি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাঁরা—তাঁদের মধ্যে ইন্দুভূষণ শিরোমণি পণ্ডিত এক বিশেষজন। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক।

শিক্ষকতার কাজে কেন নেমেছিলেন তার ইতিবৃত্ত সর্বসাধারণ জ্ঞাত নন; কিন্তু আমরা জানি সে কাহিনী। শিরোমণি জ্যাঠামশায়কে এ কাজে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন আমার স্বর্গতা মাতৃদেবী।

আমার মাতৃদেবী শিরোমণি পণ্ডিতের ছোট মা। অনুজপম আমার পিতৃদেবকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতনই দেখতেন। আমার

মাতৃদেবী সেই সূত্রে তাঁর ভ্রাতৃবধূ। কিন্তু পরম আদরের সঙ্গে এবং সশ্রদ্ধায় তিনি আমার মাতৃদেবীকে ছোটমা বলে সম্বোধন করতেন।

আমার বেশ মনে আছে বাল্যকালের স্বচক্ষে দেখা এক কাহিনী। আমাদের প্রতিবেশিনী দীন দুঃখিনী এক ব্রাহ্মণী অতি কায়ক্লেশে দু'টি নাবালক পুত্র এবং এক দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যা নিয়ে সংসার যাপন করতেন। আমার বড়মা অনেক সাহায্য করতেন এই অসহায় পরিবারটিকে। দেশ ঘরে গেলে আমার মাও যথাসাধ্য এটা-সেটা কাপড় জামা নগদ কিছু অর্থাদি দিতেন। আমরা সেই বিধবা ভদ্র-মহিলাকে কাকীমা বলতাম। তাঁর দ্বাদশী কন্যা আমার চেয়ে বয়েসে কিছু বড়। দেশে ঘরে পল্লীগ্রামে দ্বাদশী কন্যা যখন চতুর্দশবর্ষীয়া হল তখন আর বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই।

অনেক অনুসন্ধানের পর পাত্র মিললো। কেমন পাত্র তার গুণা-গুণ বিচারের প্রয়োজন নেই—যাহোক করে অনূঢ়া কন্যাদায় উদ্ধার। সমাজভ্রষ্ট না হওয়ার একমাত্র উপায়।

রায় কাকীমার মেয়ে আমার মতিদিদি। মতিদিদি শ্যামলী হৃষ্টপুষ্টা। শরীরের গোলগাল গড়ন। পাড়ার কালা কুণ্ডুর পুকুর ঘাট থেকে আসন্ন সন্ধ্যায় মতিদিদি ভিজে কাপড়ে গা ধুয়ে যখন ঘরে ফিরত অনেক গানের কলি বর্ষিত হত পাড়ার যুবককণ্ঠে মতিদিদির উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিবাহের নামে কেউই এগিয়ে আসেনি এই দরিদ্র অসহায় পরিবারটিকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে। ভিন্ গাঁ থেকে বরবেশী যে যুবকটি এক গোধূলি লগ্নে মতিদিদির বর সেজে এলেন তাঁর কথা আমার এখনো বেশ স্মরণে আছে। স্মরণে আছে, বাসর ঘরে তাঁর কণ্ঠে গীত একখানি গানের দু'এক কলি—

'এলাম সই তোদের পাড়াতে
প্রেমজ্বরে মরেছে যেজন তারে বাঁচাতে।
ওষধের এমনিই গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
জোড়া লাগে ভাঙ্গা মন, দিতে না দিতে।'

হু'টি গ্যাসের আলোকে আলোকিত রায়বাড়ির ভাঙ্গা একতলা বাড়ির উঠোন, আর একখানি পোড়ো ঘর। হু'চারজন প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন আর কয়েকজন বরযাত্রীর সমাগমে মতিদিদির বিবাহানুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়ে গেল।

প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় মতিদিদির আকুল কান্না আমার চোখ হু'টিকেও অশ্রুসজল করে তুলেছিল। মতিদিদির বিরহে সত্যিই ক'দিন ভারী মনমরা হয়েছিলাম।

মতিদিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এয়োতির সুখ-চিহ্ন সিঁতুর মাথায় ফিরে এল। সে সিন্দুর হয়ত আজো মুছে ফেলতে হয় নি। তবে প্রথমবারের পর আর দ্বিতীয়বার মতিদিদিকে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে দেখা যায়নি। অসচ্চরিত্র মাতাল স্বামী হু'একখানা বিয়ের গয়না গা থেকে খুলে নিয়ে নিরাভরণা তরুণী স্ত্রীকে বাপের বাড়ি ফেলে দিয়ে সেই যে নিরুদ্দেশ, বোধ করি আজো তার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি।

মতিদির ভবিষ্যৎ ভাবনায় মা বড্ড বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন আর আমার মাধ্যমে সমাজ-সংস্কারক শিরোমণি ভাসুরের কাছে আর্জি পেশ করেছিলেন,—'মতির মত মেয়েদের জন্যে কিছুই কী করণীয় নেই?'

শিরোমণি জ্যাঠামশায় প্রত্যুত্তরে জিগ্যেস্ করেছিলেন—'তুমিই বলো ছোট মা, মতির জন্যে কী করতে পারি আমি?'

মা বলেছিলেন, 'এইসব অসহায় মেয়েদের যদি লেখাপড়া শেখানোর জন্য মেয়েদের ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিছু লেখাপড়া শেখানোর পর আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক কোন বৃত্তি—যেমন ধরুন নার্সিং শেখানো, হাতের কাজের সেলাই-ফোঁড়াই করানো—যে কোন মেয়েদের বৃত্তিমূলক কাজ।'

শিরোমণিমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—'আমার সামর্থ এবং বিত্তেবুদ্ধি কতটুকু ছোট মা?'

'যতটুকু, আছে,—তাই কাজে লাগান না কেন?'

ছোটমার এ কথায় সত্যিই বুঝি জেগে উঠেছিলেন শিরোমণি মশায়। গোবরডাঙ্গা গ্রামের কয়েকজন সমাজসেবী যুবককে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে প্রতিষ্ঠা করেন গ্রাম্য-জুনিয়ার গার্লস স্কুল। শিরোমণি পণ্ডিত সেই বিদ্যালয়ের প্রথম অবৈতনিক শিক্ষক। মাত্র কয়েকজন মেয়ে—তাও আবার প্রতিবন্ধকতা কত! গ্রামসমাজে নারীশিক্ষা তখনো নিষেধের বাধা অতিক্রম করে নি। সমাজপতিদের ভ্রূকুটি সমাজ-দণ্ড উত্তোলন করে আছে। সে বাধা অতিক্রম করে নারী শিক্ষালয় গড়ে তোলা গ্রাম-ঘরে সত্যিই এক মহা বিপ্লবাত্মক কার্যধারা।

শিরোমণি পণ্ডিত তাই করেছিলেন। বিদ্যাসাগরকালের পরও তাঁকে মনুর শাস্ত্র নির্দেশ গ্রামের ঘরে ঘরে প্রচারিত করতে হয়েছিল—'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ, দেয়া বরায় বিদুষা ধনরত্ন সমন্বিতা।'

গোবরডাঙ্গা গার্লস হাই স্কুলের নিজস্ব ভবনটিতে যে নৈষ্ঠিক আদর্শপরায়ণ কুমারপণ্ডিত নারীসমাজের প্রতি তাঁর মমতাময় হৃদয়টি উৎসর্গীকৃত করে রেখে গেছেন আধুনিক কালের নব্যশিক্ষিত সমাজ তার সম্যক পরিচয় আজো জানে না। তবু আনন্দ পেলাম যখন আধুনিক সেক্রেটারী স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী সভায় শিরোমণি পণ্ডিতের নামটি সশ্রদ্ধায় উচ্চারণ করলেন।

শিরোমণি জ্যাঠামশায় আজ আর বেঁচে নেই; কিন্তু তার কীর্তি বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চাশতম জন্মতিথিকে মহিমামণ্ডিত করে রেখেছে। ভাণ্ডারকোলা ব্রাহ্মণ বংশজাত চিরকুমার শিক্ষাব্রতী গোবরডাঙ্গার নারী-কল্যাণ কর্মভূমিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। হয়তো মৃত্যুময় জীবনের বিলুপ্তি এবং বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে এ আমার স্মৃতির আলোকের ক্ষণদীপ্তি মাত্র।

॥ তিন ॥

কারুর মৃত্যু সংবাদে স্বভাবতই শোক খানিকটা মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। আবার যুক্তিতর্কের বিচারে আশ্বস্তও হয় মন। 'যাক্, ভালোই হল। আহা, বেঁচে থেকে যে কষ্ট পাওয়া আর সর্বরিক্ত হয়ে বেশি দিন বেঁচে থেকেই বা লাভটা কী? তার চাইতে বরঞ্চ মৃত্যু ভালো।'

হ্যাঁ, সেই সান্ত্বনাই লাভ করলাম তিপু মাসির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। স্বামীর মৃত্যুর পর সত্যিই কষ্টে পড়েছিলেন—তবু মনে একটা খোঁচা, একটা অপরাধবোধ কিছুক্ষণ যেন কাঁটা ফোটার মতন খচ্‌খচ্ করতে লাগল।

তিপু মাসিকে গত কয়েক বছর ধরে কুড়িটি করে টাকা সাহায্য করতাম। এ-বাজারে এক নিঃসন্তান বিধবা রমণীর সংসার-খরচ সামান্য এই কটা টাকার মূল্য কতটুকু? কিন্তু তিপু মাসি বলতেন—এই নাকি যথেষ্ট। আর বলতেন, 'কেই বা আমার আছে আর? তুই-ই আমার যথার্থ সন্তান।'

তিপুমাসির স্বামী মেসমশায়ও মরবার আগে এই কথাই নাকি শুনিয়েছিলেন তাঁকে—'ভয় নেই তোমার, কেউ না দেখুক অমুকে দেখবে তোমাকে।'

অমুকে অর্থে আমি। আমি তাঁর পিসতুতো বোনের কনিষ্ঠ সন্তান।

আমি কিন্তু ভেবে পাইনে তিপু মাসি হঠাৎ আমাকেই নিজের সন্তান বলে গণ্য করলেন কেন?

আর তাঁর পরলোকগত স্বামী, তাঁর নিজস্ব সংসারের এত এত আপনজন থাকতে প্রিয়তমা পত্নীকে আমার কথাই বা বলে গেলেন কেন?

সে যাই হোক। তিপু মাসি আমাকে ডেকে পাঠালেন ঠিক তাঁর স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই।

তারপর বেশ কয়েক বছর হল যখন তাঁর অগ্রজ ছুই ভাই-ই পর পর পরলোক গমন করলেন তখন আমার কাছে কিছু সাহায্যপ্রার্থিনী হলেন।

আমার মায়ের নিজের কোন সহোদর ছিল না। তাই প্রকৃত পক্ষে মামা-মাসী বা মামাবাড়ির আদর-আপ্যায়ন থেকে সত্যিই বঞ্চিত ছিলাম। তবে ছুধের সাধ ঘোলেও তো মেটে।

আমরাও তা মিটেছিল।

চব্বিশ পরগণার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত বামুনগাছি গ্রাম। বেশ বর্ধিষ্ণু পল্লী অঞ্চল। আমার মায়ের পিসে মশায় থাকতেন সেই গ্রামে। তাঁর ছুই ছেলে এবং তিন মেয়ে। ছুই ছেলে রামমোহন এবং শ্যামসুন্দর শিক্ষিত ভদ্র এবং সহৃদয়। তাঁরা আমাদের মাতুল। নিজের মামার মতই আচার-ব্যবহার এবং আচরণ। মোহন মামা আর সুন্দর মামা। তাঁদের গৃহিণীরা ছিলেন আমাদের বড়মামী আর ছোটমামী। খুবই আদর-যত্ন করতেন আর আমরাও মামা-বাড়ির প্রকৃত স্নেহের আহ্লাদ লাভের আশায় কলকাতা থেকে গোবরডাঙ্গায় যাওয়া-আসার পথে ছু'চারদিন বামনগাছিতে কাটিয়ে যেতাম।

নিজের দাদামশায়কে দেখি নি, কিন্তু মার পিসেমশায় ছিলেন আমাদের দাদামশায় তুল্য। ভারি ভালোবাসতেন তিনি আমাকে।

দাদামশায় আর দৌহিত্রে মাঝে মাঝে কবির লড়াই হতো। একবারের কথা বলি।

গ্রামের ছুটিতে কয়েক দিনের জন্যে গেছি বামুন-গাছি— মামা-বাড়িতে। সেই গ্রামের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পত্নী বিয়োগ ঘটায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। তাঁর সন্তানাদি ছিল না। বিপত্নীক দাদামশায় নিজে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নি। তাই এ বিবাহ নিয়ে তিনি অনেক বিরূপ মন্তব্য করলেন। ছড়া কেটে বললেন,

বৃদ্ধকালে সুখের ছলে যেবা বিয়ে করে;
বুদ্ধি মোটা মোনাকাটা তার সমান কে আছে এ সংসারে ?

আমাকে বললেন, 'তুমি তো কবি হে। আমার কথার জবাব দাও।'

অতএব আমাকেও চাপান দিতে হল কবির লড়াই-এ।

বিয়ে করলে বৃদ্ধকালে কিছু নেইকো কপালে
শুধু একটি সুফল ধরে,
শেষ কালেতে বধূবরণ প্রান্তরেতে বৃক্ষরোপণ,
ফলশ্রুতি ফলভোগ করে।

দাদামশায় খুশি হলেন।

দাদামশায়ের তিন মেয়ে। তিপু মাসি ছিলেন কনিষ্ঠা আর এই শ্যামতন্বী শ্যালিকার বিবাহের ঘটকালি করেন আমার পিতৃদেব।

শুনেছি আমার পিতৃদেব যখন রেল অফিসে অডিটের কাজ করতেন তখন তিনি বৌবাজারে এক মেসে থাকতেন। সেই মেসে তাঁরই ঘরে আর একজন যিনি থাকতেন তিনি পরম রূপবান পুরুষ, বড়বাজারের এক মাড়োয়াড়ি ফার্মে চাকরি করেন। গ্রাম সম্পর্কে তিনি পিতৃদেবের গ্রামের জামাতা। হঠাৎ যৌবনোত্তীর্ণ বয়সে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটায় দ্বিতীয় বার বিবাহে ইচ্ছুক হন। আর পিতৃদেবের ঘটকালিতে তিপু মাসির সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বয়সের অবশ্যই বেশ পার্থক্য ছিল।

সুদেব মেসমশায়ের দুই পুত্র ও এক বিবাহিত কন্যা থাকায় এ বিয়েতে তিপু মাসির আপত্তি থাকাটাও অনুচিত কিছু নয়। তবুও সুদেব মেসমশায়ের রূপ স্বাস্থ্য এবং অর্থ পাত্রীপক্ষকে প্রলুব্ধ করল—বিশেষ করে শ্যামলা তিপু মাসিকেও। তখনকার দিনের হিসেবে বিয়ের বয়েস পার হয়ে গেছে। তিপু মাসির ভায়েরা কেউই আপত্তি প্রকাশ করলেন না এ বিয়েতে, এমন কি তাঁর পিতৃদেবও খুশি মনেই কন্যা সম্প্রদান করলেন।

আশ্চর্য মনুষ্য চরিত্র। বয়স্ক প্রতিবেশীর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহে

যিনি ছড়া কেটে কবির লড়াই-এ প্রবৃত্ত হন, দোজবরে কন্যা সম্প্রদানে তাঁর কিন্তু অমত হয় নি। আর এমন জামাই করলেন যাঁর প্রথম পক্ষের কন্যাসন্তান বিবাহিত এবং ছেলে দুটি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

দোজবরে ঘরের গৃহিণী তিপু মাসির কী দাপটাই না দেখেছি। স্বামী তার আঁচলে বাঁধা চাবি। সৎ মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে—অপরের ঘরণী, মাঝে মধ্যে আসে। থাকে না একবেলাও, এসে বাপ ভাইয়ের বৌদের দেখাশোনা করে চলে যায়।

তিপু মাসির দুই সৎ ছেলে। বড় ছেলে বিবাহিত, অসৎচরিত্র লম্পট। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটি ফুটফুটে মেয়ে রেখে চোখের জলে সংসার-রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন—সে মৃত্যু দৃশ্য চোখে দেখি নি; কিন্তু ছোট ছেলের ফুটফুটে স্ত্রীকে নিজের চোখে দেখেছি। দেখেছি—তার জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি।

রাজা গুরুদাস ষ্ট্রিটের দেবেন দত্তের বাড়িতে আর কিছুতেই মা থাকতে রাজি নন। বার-বণিতা ঘেরা পল্লী নিতান্তই অস্বস্তিকর, অস্বাস্থ্যকরও বটে। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। আর এখানে থাকা যায় না।

পিতৃদেব অতঃপর স্থির করলেন একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একত্র থাকা। তিপু মাসিই আহ্বান জানালেন —উত্তর কলকাতার নিমতলা অঞ্চলের এক বাসা বাড়িতে। সেখান থেকে স্থান অসঙ্কুলান হওয়ায় আমরা উঠে গেলাম শোভাবাজার অঞ্চলের একটি প্রশস্ত বাড়ির একটি অংশ ভাড়া নিয়ে। অনেক ঘর-দোর আর পৃথক ব্যবস্থা। ভারি সুবিধেই হল।

তিপু মাসি আমাদের এই দুই আত্মীয় পরিবারের সংসারজীবনে সর্বময়ী কর্ত্রীত্বের আসন নিলেন।

বিবাহিতা জীবনে তিপু মাসির নিজস্ব কোন সন্তানাদি নেই। সৎপুত্রেরা ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করে,—স্বার্থের খাতিরে মাতৃভক্ত। কেন না, তিপু মাসির দু'ছেলেরই সামান্য কাজ, যৎসামান্য আয়।

তিপু মাসির তখন প্রবল আধিপত্য। মাড়োয়ারি জুট ফার্মের বড় কর্তা সুদেব মেসোমশাই দু'হাতে রোজগার করেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের রাজরাণী তিপু মাসি। তাঁর শাসনের দাপটের সামনে বাড়িশুদ্ধ তটস্থ।

দুই সংসার একান্নবর্তী প্রথমে। ঠাকুর, ঝি, চাকর—রগরগে সংসার। পিতৃদেবের ব্যবসায় তখন লাভের মুখ দেখছে আর সুদেব মেসোমশায়ের তো কথাই নেই।

এমন দিনে তিপুর মাসির বড় ছেলের প্রথমা স্ত্রী বাপের বাড়িতেই মারা গেলেন। কুলটা উপপত্নীর ঘরে বড় ছেলের রাত কাটে। ছোট ছেলের ঘটা করে বিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে কনিষ্ঠ সৎ ছেলের নতুন বৌকে খুব আদর-যত্ন। কিন্তু তারপর নিপীড়ন। সে নিপীড়ন চোখে দেখা যায় না।

আমার মা প্রতিবাদ করেন। আর তাই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি। শেষকালে দু'সংসার একান্নবর্তী থেকে পৃথক হয়ে গেল। তবুও এক-বাড়িতে যেন আর বসবাস চলে না। মায়ের প্রবল আপত্তিতে পিতৃদেব আবার অন্যত্র বাসাবাড়ির খোঁজ-খবর করতে লাগলেন।

বন্ধ্যা-নারীর মানস-কূটের পরিচয় পেয়েছিলাম,—বধূ-নির্যাতনের ক্ষেত্রে। বড় ছেলের মাতৃহারা কন্যাকে তিপু মাসি সোনার চোখে দেখতেন। কিন্তু ছোট ছেলের অমন সুশীলা, শান্ত শিষ্ট বধূ—সৎ শাশুড়িকেও যিনি মাতৃ-আচরণে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন তাঁর প্রতি এ-হেন নির্দয় ব্যবহারের হেতু বাল্যকালে বুঝে উঠতে পারি নি।

তিপু মাসির ছোট ছেলে, অম্বরদার স্ত্রীকে আমি সোনা বৌদি বলে ডাকতাম। আমাকে তিনি ছোট দেওরের অনুরূপ স্নেহ করতেন। বিশেষ করে আমার প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রবল কারণ তিনি নিরক্ষরা ছিলেন। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের জন্যেই এ-ঘরে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। দরিদ্র গ্রাম্য পিতামাতার কন্যাসন্তান। সুদেব মেসোমশায় বিনা পণে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন।

সোনা বৌদি আমাকে ডাকতেন লুকিয়ে-চুরিয়ে। হাতে দু' এক আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে আকুতি জানাতেন, 'লক্ষ্মী ভাইটি আমার! কাউকে বলো না। এই কটি কথা চিঠিতে লিখে দাও আমার মায়ের কাছে।'

আমি লিখতাম, 'মা, আর এ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছিনা। বিয়েতে কিছুই দাও নাই, তা বলিয়া পূজার তত্ত্বেও কি কিছু দিবার প্রয়োজন নাই? তোমার জামাইকে যা পারো দিবে। কিন্তু শাশুড়ি-ঠাক্‌রুণকে গরদের লালপাড় শাড়ি অবশ্য অবশ্যই পাঠাইবে।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তিপু মাসিদের সঙ্গে আমাদের তখন পৃথক সংসার—যদিও শ্যাম-বাজারের শোভাবাজার অঞ্চলের বড় তিন তলার একতলা দোতলা একটি পৃথক অংশে আমরা একই পরিবারে একত্রে ভাড়াটিয়া আছি।

সোনা বৌদির ওপর অত্যাচারের আর তিপু মাসির সর্বময় কর্ত্রী-গিরির প্রতিবাদে আমার মায়ের সঙ্গে বিরোধ বেশ দানা বেঁধে উঠেছে।

একদিন তা চরমে উঠলো।

ঘোর অমাবস্যার এক রাত্রে কাপালিক গোছের এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটলো তিপু মাসির ঘরে। সে কী যাগ-যজ্ঞ! হোমের আগুন জলছে আর তন্ত্র-মন্ত্রের সংস্কৃত দুর্বোধ্য শব্দের ঝঙ্কার। আমরা উঁকি মেরে দেখছিলাম।

মা বকে উঠলেন! তাঁর তিরস্কারে সরে আসতে হল আমাদের চার ভাই বোনকে! আমার মেজদিদি বিবাহিতা। তিনি তখন শ্বশুর-বাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি এসেছেন।

মেজদি বলে উঠলেন মাকে সম্বোধন করে, 'তুমি এই অত্যাচার সহ্য করছো কেন? এ কী? এর নাম কী পুত্রযজ্ঞ?'

ব্যাপারটা আমরা অল্পবয়সীর দল বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই দগ্ধ নরমাংসের একটা উৎকট গন্ধ যজ্ঞের ঘর থেকে

নির্গত হতে লাগল। মা দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলেন, 'নাঃ, কিছুতেই আর এ বাড়িতে থাকা যায় না। তিপু দিন দিন যা বাড়াবাড়ি সুরু করেছে!'

অধিক রাত্রে পিতৃদেব দোকান থেকে ফিরে এলে মা ভীষণ কলহ সুরু করে দিলেন, 'খুব হয়েছে, আর নয়। আত্মীয় পরিবেশ এবার তোমায় ছাড়তেই হবে। যেমন করে হোক না কেন এ বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে চলো। আমি ছেলেপুলে নিয়ে কিছুতেই এ অমঙ্গলের পরিবেশে থাকবো না—না, কিছুতেই নয়।'

মেজদিও বাবার সঙ্গে রীতিমত তর্ক করলো।

বাড়ি আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। আহিরীটোলার নিমু গোস্বামী লেনে একটি বাড়ির পৃথক অংশ। বাবার পছন্দ নয়। মায়েরও নয়। বড্ড চাপা, হাওয়া-আলোহীন বাড়ি। তবুও সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

সে-বাড়িতে যাওয়ার আগে ঠিক দুপুর বেলায় সোনা বৌদি এসে ইশারায় আমাকে ডাক দিলেন। সেদিন কী একটা কারণে যেন আমাদের স্কুলের ছুটি।

আমার হাতে এক আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে সোনা বৌদি আর্তি প্রকাশ করলেন ছলছল চোখে—'লক্ষ্মী ভাইটি আমার, তোমরা তো এবার চলে যাবে। আর মাকে আমি চিঠি লিখতে পারবো না। আমার শেষ-চিঠিখানি আজ ভাই লিখে দাও।'

এক আনা পয়সার লোভ যতটা না হোক্, কেমন যেন বেদনার সহানুভূতিতে মন আমার ভরে উঠলো সোনা বৌদির প্রতি।

চুপি চুপি গিয়ে তাঁর ঘরে খিল দিয়ে পত্রলেখা শুরু হল। তিপু মাসি তখন দিবানিদ্রায় মগ্ন। উঁকি দিয়ে দেখলাম, মেহগনি কাঠের বড় খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা। তিপু মাসি ঘুমে আচ্ছন্ন। মাথার পাশে কয়েকটি ফুল বেলপাতা সিঁদুর মাখানো; আর রূপোর কৌটায় পান জর্দা।

সোনা বৌদি বলে চললেন, আর আমি লিখতে লাগলাম—

'শ্রীচরণকমলেষু,

সহস্রকোটি প্রণাম পূর্বক নিবেদন এই যে মা, আর বোধ হয় তোমাকে চিঠি লিখিতে পারিব না। এখানে আমি আর তিষ্ঠাইতে পারিতেছি না! সর্বদাই আমার মনে আতঙ্ক—আমি আর বাঁচিব না। গর্ভে সন্তানধারণই আমার কাল হইয়াছে। অথচ তোমার জামাই কিছুতেই ইহা বুঝিবেন না। যেদিন হইতে আমার গর্ভে সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে সেদিন হইতে আমার প্রতি অত্যাচার বাড়িয়েছে। তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞ চলিতেছে। কোন এক শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সন্তান নষ্ট করিবার জন্য নানা তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিতেছেন। মা আমি আর বাঁচিব না! আর বলিতে লজ্জা হয়—শ্বাশুড়ি ঠাক্‌রুণও সন্তানবতী হইতে চলিয়াছেন যাগ-যজ্ঞের ফলে।'

এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে, এমন সময়ে দরজায় করাঘাত। মৃদু থেকে প্রবল মাত্রায় করাঘাতে বন্ধ দরজা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো।

সোনা বৌদি অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানি নিয়ে কুচিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। দোয়াত, কাগজ, কলম সরাতে না সরাতেই দরজা খুলতে হল। আর তিপু মাসি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে সে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

আমি সভয়ে বললাম, 'সোনা বৌদির চিঠি লিখে দিচ্ছিলাম।'

'কই সে-চিঠি?'

'আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।' সোনা বৌদি নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন।

'তবে রে হারামজাদী!' খণ্ড প্রলয়ের সৃষ্টি।

আর আমি তো দৌড়।

তারপরের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক।

আমরা তখন নিমু গোস্বামী লেনের বাড়িতে। তিপু মাসির সংসারের খবর আর রাখি নে।

হঠাৎ পিতৃদেব একদিন সখেদে বললেন, 'আহা, অম্বরের বৌটি মারা গেছে।'

মা চমকে উঠলেন, 'সে কী?'

'বাপের বাড়িতে ডেলিভারি হতে গিয়ে। আর তিপুও হাস-পাতালে, তার সন্তানটিও নষ্ট হয়ে গেছে।'

পিতৃদেবের এ কথায় সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলাম সোনা বৌদির অকাল মৃত্যুর জন্যে। তাঁর সেই ডাগর জলভরা দু'টি চোখের বেদনা-ময় আর্তি—'মা, আমি আর বাঁচিব না!'

সোনা বৌদি ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তার বছর খানেক পরে অম্বরদা আবার দ্বিতীয় বার দ্বারপরিগ্রহ করলেন এবং সে বৌ নিয়ে তিনি দেশে গিয়ে স্বতন্ত্র সংসার গড়লেন।

তিপু মাসির কিন্তু কী অদ্ভুত পরিবর্তন। তিনি সোনা বৌদির নবজাত শিশুটিকে কিছুতেই ছাড়লেন না। আর সেই শিশু নাতি চোখের মণি হয়ে জ্বলতে লাগলো তাঁর সংসারে। সুদেব মেসোমশায় আর তিপু মাসি জোড়াসাঁকোয় একটি বাড়ি নিয়ে আছেন। আমি এবং আমরাও মাঝে মাঝে সেখানে যাই। দেখি, সোনা বৌদির ছেলের কী আদর যত্ন! সে-ছেলে মানুষও হলো! কিন্তু তিপু মাসির দুর্ভাগ্যের দিনে তাকে আর তাঁর ত্রিসীমানায় দেখি নি।

কালক্রমে আমরা বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়িতে উঠে এসেছি। গৃহ-প্রবেশের দিন সুদেব মেসোমশায় আর তিপু মাসি এসে কী আনন্দই না প্রকাশ করলেন! অনেক দুঃখ কষ্টের পর নিজস্ব বাড়িতে মা-বাবা সুখের সংসার পেতে ছিলেন, ভাগ্যে সইল না। হঠাৎ পরপর বাবা মা দু'জনেই ইহধাম পরিত্যাগ করলেন। আমার পিতৃ-মাতৃ বিয়োগে চোখের জলে সত্যিই আমাদের সমগ্র পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হলেন, শোকার্ত হলেন, তিপু মাসি এবং সুদেব মেসোমশায়।

বাবার মৃত্যুর পর বৎসরই মা মারা গেলেন,—তিপু মাসি তখন থেকে সত্যিই নিজের মাসির মতন প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের খোঁজ-খবর নিতেন।

আমাকে প্রকৃতপক্ষে তিপু মাসি অত্যন্ত স্নেহই করতেন। আমি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। কলকাতার সর্বভারতীয় এক দিশী প্রথম শ্রেণীর বাণিজ্য-ব্যাঙ্ক সংস্থানে কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েছি। সুদেব মেসো-মশায় আসেন—টাকাকড়ি জমানো সম্পর্কে আমার পরামর্শ নেন।

তিপু মাসির নিজের ভাই আমাদের সুন্দর মামা তখন পৈত্রিক ভূমি বামুনগাছি গ্রাম ছেড়ে বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি থাকেন। তিনি এক প্রসিদ্ধ বিখ্যাত বিলিতি ব্যাঙ্ক সংস্থায় কাজ করেন। তিপু মাসির পিতৃদেব এবং তাঁর বড় ভাই মোহন মামা পরলোক গমন করেছেন। বামুনগাছি মামাবাড়ির আর কোন জৌলুষ নেই।

সুদেব মেসোমশায় আমাদের ব্যাঙ্কে তিপু মাসির জন্যে কিছু টাকা নির্দিষ্ট ভাবে জমা রাখতে চান। বৃদ্ধ হয়েছেন, মনে আশঙ্কা তিনি বুঝি তিপু মাসির আগেই মারা যাবেন।

কিন্তু তা কী করে হয়? সুপুরুষ চেহারা তখনো তাঁর। দিব্যি কর্মক্ষম। তখনও বেশ জাঁকিয়ে অফিস করছেন, তবে পূর্বের প্রতি-পত্তি আর নেই। মাড়োয়ারি জুট ফার্ম কর্তাব্যক্তিদের সন্তানরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। দু'একজন আবার সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন বিজনেস আর ম্যানেজমেণ্ট সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে। বাপের আমলের পুরাতন কর্মচারীর এখন রিটায়ার করাই উচিত। যাহোক্—বিদায়কালীন কিছু গ্র্যাচুয়িটি নিয়ে সরে পড়ো না কেন। কিন্তু ততটা দুর্যোগ সুদেব মেসোমশায়ের জীবিত কালে অবিশ্যি হয়নি। তবে বেতন কমেছে, উপরি পাওনা-গণ্ডা একেবারেই বন্ধ।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠেছে। সেই জলন্ত আগুনের ছোঁওয়া শুধু রণাঙ্গণে নয়,—ভারতবর্ষের বাইরেই নয়

—ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে সে-আগুনের জ্বলন্ত শিখা। বাজারপত্র আগুন, অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—দুর্ভিক্ষ।

সুদেব মেসোমশায় কিছুতেই শুনলেন না—বিদেশী ব্যাঙ্কে সব টাকা রাখবেন না।

অতএব আমাদের ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে কিছু থাক্—তাঁর অবর্তমানে আমি যেন সব দেখাশোনা করি। সৎ দুই ছেলে কিংবা নাতি-নাতনী এসে ফাঁকি দিয়ে না নিয়ে যায়।

তিপু মাসির নিত্য রোগ বহু পূর্ব থেকেই। তখন রোগের আতিশয্য ছিল আর স্বামী-সোহাগিনী তিপু মাসির জীবনের সে এক বড়মানুষী আভিজাত্যও বলা যেতে পারতো।

কিন্তু দিন তো আর সমান যায় না।

তবুও আমাদের ধারণা তিপু মাসিই আগে যাবেন। সৎ ছেলে সরে পড়েছে। যে যার নিজস্ব সংসার নিয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। আর একত্র থেকে কি লাভ? তিপু মাসিকে বঞ্চিত করে সুদেব মেসোমশায় কী পুত্রস্নেহে বিগলিত হয়ে পড়বেন শেষ বয়সে? না, সে সম্ভাবনা নেই। তাই ছেলেরা ধারে কাছে ঘেঁষে না। যে নাতিকে চোখের মণি করে রেখেছিলেন সেও নাকি চাক্‌রি-বাক্‌রি পেয়ে লাভ-ম্যারেজ করে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। এমন কী দুর্ভাগ্যের কথা,—তিপু মাসির বড় ছেলের একমাত্র যে মেয়েকে মানুষ করে ভালো বরে-ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন অনেক টাকা বরপণ আর যৌতুক দিয়ে—নাতনিকে গা-ভর্তি গয়নায় সাজিয়ে গুজিয়ে—সেও আর ঠাকুরদা ঠাকুরমার খোঁজ খবর নেয় না।

এমন দিনেই হঠাৎ একরাত্রে সুদেব মেসোমশায় ইহধাম পরিত্যাগ করলেন। আর ঠিক তার কয়েক মাস পরেই মোহন মামাও গত হলেন।

তিপু মাসি অকূল পাথারে পড়লেন। টাকা-পয়সা গয়না-গাটি

যাহোক্ কিছু ছিল। অন্তত একজন বিধবা রমণীর অবশিষ্ট জীবন-যাপনের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ তো নয়ই।

দেশ থেকে অম্বরদা সৎমাকে নিজের সংসারে নিয়ে যেতে এলেন; কিন্তু তিপু মাসি যাবেন না। তিনি বলেন, 'ওকে বিশ্বাস নেই, ও আমায় বিষ খাইয়েও মেরে ফেলতে পারে। আমার গয়না গাটি টাকা পয়সার হিসেব এখন থেকেই চাইছে।'

সংসারে আর কাউকে বিশ্বাস নেই তিপু মাসির। বিশ্বাস আমাকে, 'তোর মেসোমশায় লোক চিনতেন। মরবার সময় তোর কথাই বলে গেছেন আমাকে।'

কী মুশকিল! তাঁর আত্মীয়পরিজনের বিরাগভাজন হয়ে এ গুরু দায়িত্বের ভার কেমন করে আমি নিতে পারি, সে কথা বার বার বুঝিয়েও তিপু মাসিকে তাঁর দেশের বাড়িতে ছোট ছেলের কাছে পাঠাতে পারিনে কিছুতেই। অথচ দেশের বাড়ির ষোল আনা অংশের সত্ত্বাধিকারিণী তিপু মাসি। যাবজ্জীবন তিনি বেঁচে থাকবেন দেশের বাড়ি ঘর সবই তাঁর।

সুদেব মেসোমশায় দেশের সম্পত্তির জীবদ্দশার অধিকার ছাড়াও তিপু মাসির নামে ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলে গেছেন। বুঝে চলতে পারলে তিপু মাসির বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকার কথা। আরো কিছু অর্থের অনুদান মিলতে লাগল পরলোকগত স্বামীর অফিস থেকে কয়েক বছর প্রতি মাসে।

সুতরাং তিপু মাসি কলকাতা ছেড়ে গেলেন না। একখানি ঘরে সামান্য ভাড়ায় তিনি স্বস্থানেই থেকে গেলেন।

প্রথম প্রথম আত্মীয়-স্বজনের যথেষ্ট আনাগোনা চলত, কিন্তু তিপু মাসি সতর্ক—যক্ষের ধন আঁকড়ে আছেন। কাউকে কিছু বুঝতে-জানতেও দেন না।

সর্ব বিষয়ের তদারকিতে কেবল আমাকে ডেকে পাঠান আর পরম আশ্বাসের প্রত্যাশার কথা আমাকে শোনান—'দেখিস্, সে ঠিকই আসবে।'

'কার কথা বলছ মাসি।'

'অম্বরের ছেলে মণিশঙ্করের কথা। সে যে আমার অন্ধ চোখের মণিরে!' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন তিপু মাসি,—'সবই রইল তার জন্যে। আমার সব টাকা-পয়সা সে ভোগ করবে। দামী দামী গয়না রে—তোর মেসোমশায় রাজরাণীর সাজে সোনা-দানায় আমাকে সাজিয়েছিল, সে সব টাকা-পয়সা মণির বউ-এর জন্যে ব্যাঙ্কে রাখা আছে। কাগজ পত্তরগুলো তুই ঠিক করে দিস তো এবার।'

আমি বলি, 'কী করে দেবো ?—তোমাকে তা হলে উইল করে যেতে হয়।'

'কেন মমিনি করা যায় না।'

তিপু মাসির কথার উত্তরে বলি, 'না, তা হয় না।'

কিন্তু তিপু মাসির তার জন্যে বিশেষ আক্ষেপ কিছু নেই—'সে বউ নিয়ে নিশ্চয়ই আসবে। ঠিক আসবে দেখিস্। আমি বেঁচে থাকতেই আসবে।'

এদিকে দিন দিন স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের দ্রব্য মূল্য আগুনের মত বেড়ে চলেছে। সুদেব মেসোমশায়ের অফিসের সামান্য মাসিক অনুদানও বন্ধ হয়েছে। তিপু মাসির একলার সংসার চালানোর ব্যয়-নির্বাহও দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

'কিছু গয়না এই বেলা বেচে ফেল মাসি। সোনার দাম বেশ বাড়তির মুখে। আর সেই টাকা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে রেখে দাও, মাসে মাসে সুদ পাবে।'

তিপু মাসি কিন্তু তাতে রাজি নন—'ওগুলো যে আমার মণির বউ-এর গচ্ছিত ধন।'

'সে কী ? ওতো তোমার গয়না।'

তিপু মাসি সবেগে মাথা নেড়ে বলেন, 'না, না, আমার নয়। আমি সে সব তাকে সব শর্ত ত্যাগ করে দিয়ে দিয়েছি রে। দিয়ে আবার ফেরৎ নিয়ে শেষকালে কী কালীঘাটের কুকুর হয়ে জন্মাব ?'

অতএব তিপু মাসিকে জীবদ্দশায় কয়েক বছর মাসে মাসে কিছু করে অর্থ সাহায্য করতে হয়েছে আমাকে। মাসে কুড়িটি টাকা এ দুর্মূল্যের বাজারে কীই বা দাম তার? তবু তিপু মাসি তাতেই যথেষ্ট খুশি—দু'হাত তুলে নিত্য আশীর্বাদ করেন আমাকে।

মাসে কুড়িটি টাকা। প্রথমে তেমন গায়ে লাগল না। কিন্তু মাস কয়েক পরেই লাগতে লাগল। শুধু আমার নিজের আত্মীয় স্বজনরাই নয়, নিজেরও বিরক্তি বোধ হতে লাগল—কেন, আমার কিসের দায় দায়িত্ব। আর তিপুমাসি তো সহায়হীনা নন। তাঁর নিজস্ব যা আছে তাতে তাঁর দিনপাত হওয়া মোটেই কষ্টের নয়। সে যুক্তি তিপু মাসি কিছুতেই মানবেন না। যে চোখের মণির জন্যে এত কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন সে তো ভুলেও তাঁর খোঁজখবর নেয় না। পরন্তু তার পরলোকগতা মায়ের কথা মনে পড়লেই শুধু তার কেন আমারও তিপু মাসির প্রতি কোন সহানুভূতিহ মনে জাগে না।

শেষে ইদানীং ইচ্ছে করেই গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। চিঠির পর চিঠি দিলেও তাঁর বাড়ির ধারে কাছে ঘেঁষতাম না।

তিপু মাসি কিন্তু নিজেই এসে হাজির হতেন। মাসিক বরাদ্দ কুড়িটি টাকার জন্যে নির্লজ্জের মতন হাত পাতেন। অতএব নিরুপায়। মনকে বোঝাতাম—পূর্বজন্মের এ ঋণ আমার পরিশোধ না করে আর উপায় কী?

পুজোর পর মাস কয়েক আবার গা-ঢাকা দিয়েছিলাম।

পুজো অবকাশ যাপন সেরে বাড়ি ফিরেও তিপু মাসির বাড়ি যাই নি। আঁকা-বাঁকা অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের খান দুই পত্রের পাঠোদ্ধার করেও নিস্পৃহ ছিলাম—তিপু মাসি নাকি খুবই অসুস্থ; কিন্তু তবুও গা করি নি।

বেশ কিছুকাল আর তিপু মাসির কোন খোঁজ খবর নেই। টাকার চাহিদা নেই, তিনি নিজেও আসেন না, কাউকে দিয়ে খবরও পাঠান না।

এমন দিনেই শেষ-খবর পেলাম।

আর সে খবর যে বহন করে নিয়ে এল,—সে আর কেউ নয়, সে হচ্ছে তিপু মাসির চোখের মণি মণিশঙ্কর। রোগা একাহারা ফর্সা ছিপ ছিপে যুবক ম্লান মুখে তিপু মাসির মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এসেছে।

'আপনি যা করেছেন দিদার জন্যে।'

হঠাৎ যেন এ-কথায় পিঠে এক চাবুকের কষাঘাত অনুভব করলাম। চোখ দু'টির সঙ্গে সর্বাঙ্গ আমার আঘাতের দুর্দান্ত জ্বালায় জ্বলে উঠল। অনুশোচনায় মন দগ্ধ হতে লাগল,—কুড়িটি মাত্র টাকা! কত ভাবেই তো কত টাকা জীবনে অপব্যবহার করছি। শেষ কটা মাসের জন্যে কেনই বা—

মণিশঙ্কর বললে,—'শেষ বেশ একটা উইল করে গেছেন দিদা, সবই আমাকে দিয়ে গেছেন। কোর্ট থেকে প্রবেট নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনাদের ব্যাঙ্কের সেফ ডিপজিট ভল্টে দিদার যে সব গয়না আর ফিক্সড ডিপোজিটে যে টাকা—'

বললাম, 'আজ মনটা ভালো নেই, আজ থাক না এ প্রসঙ্গ! তোমার সঙ্গে যে তাঁর শেষ দেখাটা কি ভাবে হল তাই বরঞ্চ বলো।'

মণিশঙ্কর কি যে বলছিল তা ঠিক মনে নেই। মনে আছে কেবল তার ডাগর দুটো চোখের সেই জল ভরা চাউনি যার সঙ্গে অত্যন্ত যেন মিল খুঁজে পেয়েছিলাম স্বর্গতা সোনা বৌদির দৃষ্টি ধারায়।

।। চার ।।

বুলিদিকে দেখে যেন এক অত্যাশ্চর্য ঘটনার সম্মুখীন হলাম।

সেই বুলিদি—ছেলেবেলায় বর-কনে খেলায় যে একদিন আমার বউ সেজেছিল।

কত কত দিন আগেকার চেনা-জানা সেই বুলিদি—শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলার সেই তিন মহলের বড় বাড়িটি, সেই বাড়ির একটি

মহল দিন দুপুরেও থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন, নিচের তলা থেকে এক মহলের দোতলায় যে সিঁড়িটি, সেটি দিন দুপুরে পরিত্যক্ত। বড় একটা লোকজনের চলাচল নেই সে পথে। কেমন যেন একটা গা-ছমছমে ভাব। সেখানে স্কুল না থাকলে আমরা কিশোর-কিশোরী কয়েকজন মিলে বর-কনে, রাণী খবর আইল কিংবা চোর-পুলিস খেলতাম।

বাড়ির এক মহলে তিপু মাসিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বসবাস। আর এক মহলে একতলায় প্রকাণ্ড বৈঠকখানা জুড়ে ফরাস পাতা। সেই বৈঠকে চলে গৃহস্বামিনীর অবিবাহিত প্রৌঢ় দেবর মদনবাবুর সকাল সন্ধ্যে রাত্রের তাস, পাশা, দাবার আড্ডা, সঙ্গীতের আসর— সেকালের ধনাঢ্য পরিবারের মজলিশ। কিন্তু মদ্যপান, মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্তি তা বলে নয়। মোসাহেবের দলও আসেন,—মদনবাবুর বৈঠকে রাজা-উজীরের গালগল্প উড়িয়ে গড়-গড়ায় সুখটান দিতে দিতে বালাখানার সুগন্ধী তামাকের ধোঁওয়া ছেড়ে চা-জলখাবারের সঙ্গে রাত্রের খাওয়াটাও তাঁদের ভাগ্যে জুটে যায়।

মদনবাবু বেঁটে খাটো লোক—সুপুরুষ না হলেও কুপুরুষ বা অপুরুষ নন। কলকাতা হাইকোর্টের স্ট্যাম্প ভেণ্ডারীর কাজ। নিজে একলা মানুষ, দু'পয়সা কামান ব্যবসাদারিতে। সংসারে দায়-বিদায় নেই। কেননা, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ বিধবা হলেও কলকাতা শহরের এই বড় অট্টালিকার উত্তরাধিকারিণী। আর শেয়ার বাজারের শেয়ার, কোম্পানির কাগজ, বাড়িভাড়ার আয়, সোনা-দানার বন্ধকী-কারবার এবং ব্যাঙ্কে মোটা টাকার ব্যালেন্স। এক কথায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী। সমস্ত বাড়িটি তাঁর অধীনে—মায়, আমরা যে মহলের ভাড়াটিয়া, সে মহলেও কর্ত্রীত্ব করেন তিনি মাঝে মধ্যে।

গৃহস্বামিনী আমাদের মাননীয়া মাসিমা। আমার মা এবং তিপুমাসি তাঁকে বড়দি বলেই সম্ভাষণ করেন। শুধু বড়দি সম্ভাষণই নয়, বড়দির মতনই শ্রদ্ধা এবং শাসনভীতি।

মদনবাবু তাঁর বউ-ঠাকরুণের আজ্ঞাধীন। তাঁর মহলটি

দোতলায়। একতলায় বিরাট বৈঠকখানার বৈঠক, তার পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু তিনটি ঘর, সেই ঘরে মদনবাবুর স্ট্যাম্প ভেণ্ডারী অফিসের দু' একজন কর্মচারি এবং দোতলার সুবৃহৎ ঘরটি তাঁর শয়ন কক্ষ আর তার পাশের ক্ষুদ্র কামরাটি খাস চাকরের বাসঘর। বাবুর সঙ্গে খাস চাকর গণেশ হাইকোর্টে যায় বাবুর ফীটন গাড়িতে এবং সন্ধ্যায় ফেরে একই সঙ্গে।

গা-ছমছমে সিঁড়ির মাঝখানে কলঘর—সেখান থেকে সুরু করে দোতলায় মদনবাবুর ঘর, আর সেই ঘর সংলগ্ন দুটি ক্ষুদ্র কামরা এবং প্রশস্ত বারান্দা জুড়ে আমাদের কিশোর-কিশোরীর মেলা। গল্পগুজব, খেলাধুলো, চুরি করা আমসত্ত্ব, কুলের আচার, কাসুন্দি—ইত্যাদি রসিয়ে রসিয়ে খাওয়ার পালা। অবশ্যই ছুটির দিনে।

রবিবারে কখনো-সখনো যেদিন মদনবাবু নিজের মজলিশ ছেড়ে অপর বন্ধু-মজলিশে যান সেদিন আমাদের পোয়া বারো।

দোতলার সিঁড়ি বাঁক খেয়ে তিনতলায় উঠে গেছে। সমস্ত বাড়িটির আচ্ছাদনে বিরাট তিনতলা মহল। এই মহলে গৃহস্বামিনী বা বড় মাসিমা থাকেন। চাকর বাকর, রাঁধুনিদিদি তো আছেনই—তা সত্ত্বেও বড় মাসিমার আর এক বিধবা বোন আমাদের সঙ্গী মাণিকের মা, তাঁর দুই ছেলে আর বড় মাসিমার মৃতা ছোটবোনের মেয়ে বুলিদির বসবাস। এই মহলের সঙ্গে আবার যুক্ত পৃথক আরেক পরিবার। তিনতলার দক্ষিণাংশ এবং চারতলার ছাদের অন্তর্গত আরো দুখানি ঘর জুড়ে রমলাদির সংসার।

গৃহস্বামিনী বড় মাসিমার একমাত্র দুলালী কন্যা রমলাদি। তিনি এক ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকেন রাজকন্যার আদর আপ্যায়নে। রমলাদি পরম রূপবতী,—টিকালো নাকে হীরের নাকছাবি ঝলমল করে। হাতের অনামিকায় হীরের আংটি, গলায় সাচ্চা মুক্তোর মালা, দু'হাতে সোনালী চুড়ির চটক, কানে দামী পান্নার বাহার।

বিবাহিতা, যুবতী, সুন্দরী। কিন্তু স্বামীর ঘর করেন না। সে নাকি বড় ঝঞ্ঝাটের সংসার। শ্বশুরবাড়িও অভিজাত। তবু রমলাদির আধিপত্য খাটে না বলে বাপের বাড়িতেই থাকেন। আর অভিজাত-বংশীয় পড়তি বনিয়াদী বংশের দুলাল রমলাদির স্বামী রোজই সন্ধ্যার পর আসেন শ্বশুরবাড়িতে—ঘরজামাই হতে চান না, তাই সাত সকালেই আবার উঠে চা জলযোগ সেরে মদনবাবুর ফীটন গাড়িতে চেপে চলে যান অদূরবর্তী শ্যামবাজার আরেক অঞ্চলের বাপের বাড়িতে। পৈত্রিক ব্যবসা বড়বাজারের চিনিপটিতে—রমলাদির স্বামী সে ব্যবসার অংশীদার। কিন্তু তখন বুঝি পড়তির বাজার, তাই বাপ ঠাকুরদা যা করে গিয়েছিলেন তা ক্ষয়ের খাতায়।

একাদিক্রমে প্রায় চার বছর আমরা এই অংশের ভাড়াটিয়া ছিলাম। আমরা এবং পূর্বকথিত তিপুমাসিরা। মাসিক ষাট টাকার ভাড়াটিয়া দু তরফে তিরিশ টাকা করে ভাগাভাগির ব্যাপার। এক এক তরফে চারখানি করে ঘর। আর রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং বাইরের বৈঠকখানা, সিঁড়ি, কলতলা, বাথরুম, প্রিভি সব কমন।

বাড়িওয়ালী বড়মাসির তিনতলা এবং চারতলার বিরাট মহলে আমার প্রবেশাধিকার ছিল বিশেষ একটি কারণে। ছেলেবেলায় আমি গান গাইতাম। আর সে গানের সমঝদার শ্রোতা ছিলেন ওপর মহলের সবাই। বড় মাসিমা কীর্তন এবং শ্যামা সঙ্গীতের ফরমায়েস করতেন। রমলাদি রবীন্দ্রসঙ্গীত আর সেকালের নির্দোষ দু-একটি প্রণয়সঙ্গীত শুনতে ভালবাসতেন। তাই আমার বিশেষ কদর ছিল তিন তলা চার তলার অন্দর মহলে।

আমার মা অবিশ্যি খুব পছন্দ করতেন না বড় ঘরের সঙ্গে এমন অবাধ মেলামেশার ; কিন্তু প্রকাশ্যে বড় একটা কিছু বলতে পারতেন না গৃহস্বামিনী বড় মাসিমার দাপটের ভয়ে।

দুপুরে কিশোর-কিশোরীদের আড্ডাখানায় যাওয়া কিন্তু নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বুলিদি বড় হয়েছে, এখন আর তার সঙ্গে অমন হুটোপুটি

খেলা না করাই সমীচীন। তখনকার দিনে বিয়ের বয়েস হলেও বুলিদিকে নিয়ে দুর্ভাবনা বড় মহলের কারুরই ছিল না।

পাকাপাকা কথা বুলিদির। লুকিয়ে চুরিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে আমার মার কাছে অনেক অভিযোগ-অনুযোগ প্রকাশ করে যেত বড় মহলের নানা কুৎসা-গাওনার কথা-বার্তায়। মা তাই তার সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।

তবু মায়ের সহানুভূতি ছিল মা-মরা কিশোরী মেয়েটির প্রতি।

মা সহানুভূতির স্বর মিলিয়ে বলতেন, 'হ্যাঁ বুলি, লেখা পড়া শিখলি না, বিয়েথারও কোন উদ্যোগ নেই তোকে নিয়ে—জীবনে করবি কী?'

নাকের অসুখে ভোগে বুলিদি। সুন্দর সুশ্রী চেহারা হলে কী হয়—খোনা নাকের কণ্ঠস্বর তার। আর প্রতি ঋতুতেই নাক আর কান নিয়ে ভোগে মেয়েটি।

বাড়িওয়ালী দিদিকেও মা একদিন বুলিদির ভবিষ্যতের কথা নিয়ে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু বৃথা প্রচেষ্টা।

'ও মেয়ে আমার গলার কাঁটা বুঝলে না। পড়াশুনোর জন্যে কম করেছি? স্কুল পালিয়ে কুসঙ্গে পড়েছিল। বাড়িতে মাস্টার রেখেও রেহাই নেই—এই বয়সেই আগুন ধরায়। কী করব বলো—যা ওর কপালে আছে তাই হবে।'

বাড়ীওয়ালী দিদিকে মা ওর চিকিৎসার কথা বলেছিলেন।

তাও নিরর্থক! 'কম চেষ্টা করেছি, আর কম অর্থব্যয়! খোনা মেয়ের কী নাক সারে?'

এরপর আর বলার কিছুই নেই।

বুলিদি আমাদের বাড়িতে আসে বাড়িওয়ালী মাসির তাতে ঘোরতর আপত্তি। মাও এড়িয়ে যেতেই চান। আমরা বুলিদির সঙ্গে মেলামেশা করলে আবার কি অশান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়-তাই মা প্রকারান্তরে আমাদের নিষেধই করতেন ওর সঙ্গে খেলাধুলো না করার জন্যে। আর তেরো-চোদ্দ বছরের সোমত্ত মেয়ে দশ-এগার বছরের

ছেলেদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি করবে সেকালে এ রীতিও পছন্দসই ছিল না অভিভাবকবৃন্দের কাছে।

তবু একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল আমার কৈশোর-জীবনে এবং তা বুলিদিকে নিয়েই।

সেদিন স্কুলের ছুটি। শীতের দুপুর বেলা। তিপুমাসির বড় ছেলের মেয়ে জয়া এসে চুপিসারে আমাকে ডাক দিল। সুবর্ণ সুযোগ; ছুটির দিন হলেও বাড়ি একেবারে ফাঁকা। আমাদের মহলে মা গেছেন তাঁর ছোটবোনের বাড়ি—আমার ছোড়দা এবং ছোটবোনকে নিয়ে। বাবা দোকানে। তিপুমাসি শীতের দ্বিপ্রহরের সুখনিদ্রায় মগ্ন। তাঁর ছেলে বৌ গেছে দেশের বাড়িতে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার কারণে আমি ছিলাম একা।

আরেক মহলেও কেউ নেই। মদনবাবু ফীটনে গেছেন ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে পিক্‌নিক করতে। সঙ্গে নিজস্ব চাকর। একতলার কর্মচারিরাও নেই। আর তিনতলা এবং চারতলার রাণীমহলে দিন দুপুরে জামাই এসেছেন। রমলাদির বর। তাই ও-মহলে জামাই আদরের ঘটা।

জয়া বললে, 'নীলকাকু ও বাড়ির দোতলায় চলো। আজ আমরা এক মজার খেলা খেলবো। বুলি মাসি তোমাকে ডাকছে।'

'আমার এখন পরীক্ষার পড়া। যা, বিরক্ত করিস্ নে।'

জয়া বয়সে আমার চেয়ে দু'বছরের আরো ছোটো, কিন্তু কথায় একেবারে পাকা গিন্নী, 'আহা, সারা বছর পড়েও কিছু হল না, এক বেলার পড়াতে উনি ফার্স্টো হবেন!'

তাড়া দিলাম, 'যা, যা, পাকামী করিস নে। পড়াশুনোর কী বুঝিস্ তুই। মুখ্যুর ঢেঁকি!'

কিন্তু না, প্রলোভন এড়ানো গেল না। জয়া আমার কানে কানে বললে, 'আজকের খেলা জীবনে কোনদিন খেলো নি নীলকাকু। চলো। আচ্ছা, ভালো না লাগলে তুমি চলে এসোখন।'

প্রলুব্ধ হয়ে জটিল অঙ্ককষা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

সত্যিই ভারি মজার খেলা। আর এ খেলা আমার জীবনে এই প্রথম। কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি!

শুনলাম, এ রকম খেলা ঠিক দুপুরে আরো দু-চারবার মদনবাবুর দোতলা ঘরের সামনের প্রশস্ত বারান্দায় এবং তৎসংলগ্ন ছোট দু'খানি ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুলিদির দুই মাসতুতো ভাই মাণিক এবং কার্তিক সেজেছে দুই বর, আর বুলিদি ও জয়া দুই কনে। বর-বউ খেলা।

আজ কার্তিক নেই, তাই একটি বরের অভাবে ডাক পড়ছে আমার।

বুলিদি বয়সে আমার চেয়ে দু' তিন বছরের বড়। তাতে কিছু এসে যায় না। বুলিদি বললেন, 'হিন্দুস্থানীদের বউ বরের চেয়েও বয়সে বড় হয়, জানিস্।'

পূবের ঘরে আমরা আর পশ্চিমের ঘরে জয়ার সঙ্গে মাণিকের সংসার।

জয়া আর মাণিক এ খেলায় এক্সপার্ট। বাজারের থলি হাতে নিয়ে জিনিস-পত্তর মেলানো, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা এবং দাম্পত্য-কলহে মাণিক আর জয়া কেউই কমতি যায় না।

আমি কিন্তু একেবারে আনাড়ি এ ব্যাপারে। তাই বুলিদি স্ত্রী হয়ে যখন বাউণ্ডুলে কবিয়াল স্বামীকে তিরস্কার করতে লাগলো, 'সারা দিন শুধু গান লিখে আর কবি-গান গেয়েই দিন কাটাবে? এদিকে ভাঁড়ে মা ভবানী। ঘরে একটি দানাও চাল নেই। বাড়িওয়ালা নুটিশ দিয়েছে, আজকের মধ্যে বকেয়া বাড়ি ভাড়া দিতে না পারলে দারোয়ান দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে এ বাড়ি থেকে। ছেলেমেয়ে-দের নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো বল দিকিন্?'

বুলিদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো, 'মরণও হয় না আমার! নিত্যি নিত্যি এ জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি নে। বাবা মা এমন

করে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গার জলে কেন যে ফেলে দিলে না!'

বুলিদির অভিযোগে হতভম্ব হয়ে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু নিরুত্তরে তাকিয়ে থাকি।

ওদিকে মাণিক খুব জোর শাসাচ্ছে জয়াকে, 'বউ না নাগিনী। কী ছোবল রে বাবা। ফের যদি ফোঁস ফোঁস করো এমন সাপের মন্ত্র আওড়াবো—ফণার বিষ চিরকালের জন্যে ঘুচে যাবে কিন্তু।'

বুলিদি আমাকে বরের উত্তর শিখিয়ে দেয় বার বার। আমি তারই জাবর কাটি।

বুলিদি অভিযোগ করে, 'দূর, তুই একেবারে আনাড়ী।' পরক্ষণেই হাতের কাঁচের চুড়ি খুলে আমার হাতে দিয়ে বলে, 'এই শেষ সম্বল। যাও, স্যাকরার দোকানে বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসো।'

খেলাটি কিন্তু তেমন সম্যক্ ভাবে জমে উঠলো না সেদিন। হঠাৎ শুনি বাড়িওয়ালী বড়মাসির তির্যক কণ্ঠস্বর, 'বুলি, ও হারামজাদী বুলি। ঠিক দুপুর বেলায় গেলি কোথায়—বাড়িতে জামাই এসেছে একটু আক্কেল বিবেচনা পর্যন্ত নেই?'

দুড়দাড় করে অতঃপর পলায়ন আমাদের। বর-কনের সংসার রইলো পড়ে।

শ্যামবাজারের তিনমহল বাড়ি ছেড়ে আমরা উঠে এলাম আহিরীটোলার স্বতন্ত্র বাড়িতে। জয়া, মাণিক, বুলিদি আর আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

মাণিকরাও ও-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। মাণিকের গরীব এক মামা এসে বোনের দুর্গতি মোচন করেছেন বড়লোক বোনের সংসার ভাড়না থেকে।

তিপু মাসিরা আরো কয়েক বছর ছিলেন ও বাড়িতে। মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে চুরিয়ে দু'চারবার প্রথম প্রথম আহিরীটোলা

থেকে শ্যামবাজার পাড়ি দিয়েছি। রমলাদিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নির্দোষ প্রণয়সঙ্গীত দু'একটা শুনিয়েছি, বাড়িওয়ালী বড়মাসিকেও শুনিয়েছি রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত।

বছর খানেক পরে এমনই একদিন শুনলাম, বুলিদির বিয়ে হয়ে গেছে। বুলিদি নেই,—বর্ধমানের কোন এক অখ্যাত পল্লীতে সে এখন সত্যিকারের বউ হয়ে গেছে। বুলিদির সঙ্গে সেদিন আর দেখা হল না।

তিপুমাসির নাতনি জয়ার বিয়ে। সে বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা সবাই শ্যামবাজারের তিন মহলের বাড়িতে সমুপস্থিত হলাম।

জয়াকে সেদিন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পরণে লাল বেনারসী শাড়ি, গায়ে নীল সিল্কের ব্লাউজের ওপর সোনালি টিপ দেওয়া বেনারসী ভেল। চন্দনচর্চিত ললাট, কপাল জুড়ে মুক্তোর টায়রা, কানে জমকালো কানবালা, গলায় জড়োয়ার হার, হাত ভর্তি রিস্টলেট, বালা, সোনার বোম্বাই বেঁকি চুড়ির ঔজ্জ্বল্য, বাজুবন্ধ আর হাতের আঙুলে জ্বল জ্বল করছে পাথর এবং মুক্তো বসানো আংটি।

জয়া নিখুঁত সুন্দরী নয় অবিশ্যি রমলাদির মতন, বুলিদির মতন দেহের আঁটসাঁট গড়ন এবং চোখের বাহারও নেই। মুখশ্রী তেমন সুন্দর সুশ্রী নয়,—কিন্তু গায়ের রং ধবধবে সাদা। কথায় আছে যে সর্বদোষা হরে গোরা—জয়ার গায়ের রং ঠিক তেমনি। আর চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে সেদিন যেন বিয়ের কনে সেজে সুন্দরী যুবতীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

মাণিকরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সেই মাণিক যে নাকি বহুদিন বর-কনে খেলায় জয়ার স্বামী সেজেছে।

মাণিক সুপুরুষ অবিশ্যি নয়, তাহলেও জয়ার বর দেখে মাণিকের কিছুটা সান্ত্বনা লাভ অবশ্যই হয়েছিল। নববধূ জয়া সেদিন মাণিকের সঙ্গে আর কথাবার্তা না বলায় তার মনে বিক্ষোভ জাগা খুবই

স্বাভাবিক,—জয়ার বেঁটে-খাটো অতি সাধারণ চেহারার বর দেখে তাই সে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলো, 'ভারি রূপের বর, তার আবার এত ডাঁট! অহংকারে যেন ডগমগ করছে,—আমার সঙ্গে কথাই বললে না। যেন আমাকে চেনেই না।'

আমায় দেখে চোখ ফিরিয়ে মাণিক আবার গর্বিত মন্তব্য প্রকাশ করলো, 'দেখবি তোরা, নিশ্চয়ই দেখবি। আমি যাকে বিয়ে করব, জয়ার চেয়ে কত কত বেশি সুন্দরী মেয়ে সে।'

পাশ থেকে খোনা নাকের খোনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'তুঁই চুঁপ কর। সুঁন্দরী বঁউ পেতে হঁলে যোঁগ্যতার দঁরকার। জঁয়ার বঁর বঁড় চাকরি কঁরে জাঁনিস্। অঁনেক টাকা মাইনে।'

চম্‌কে উঠে পাশ ফিরে দেখলাম বুলিদিকে। কথা কটি মাণিকে'র দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সে নিমেষে সরে গেল।

কিন্তু এ কী রূপ বুলিদির! বিবাহিতা বুলিদিকে আমি দেখি নি। আজও দেখলাম না এয়োতির সজ্জায় বুলিদিকে। পরণে কালো নরুণ পেড়ে ধুতি, গায়ের সাদা ব্লাউজ ফুটে শুধু যৌবনের দীপ্তি। সিঁথিমূল সাদা ধবধবে।

বুলিদি! হ্যাঁ, বুলিদিই বটে। বিয়ের বছর না ঘুরতেই বিধবা বেশে ফিরে এসেছে বড় মাসিমার গলগ্রহ হয়ে।

সাজ দেখে তাজ্জব বনে গেলাম রমলাদির। সমস্ত অঙ্গ জুড়ে উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কার আর জ্বলজ্বলে জড়োয়ার গহনা। আর কী দামী কাতান, ঘন নীল বেনারসী শাড়ির ঝকঝকে সোনার জরির ফুলের বাহার! নববধূ জয়ার বিবাহবাসরে এগিয়ে আসতে আসতে পলায়নরতা বুলিদির দিকে দেখে ভর্ৎসনা প্রকাশ করলেন, 'তুই আবার এখানে এসেছিস্ কেন? জানিস নে তোর কপাল পুড়েছে।'

বুলিদি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেল। কোথায় যে গেল তার আর হদিস পেলাম না। মনটা আমার অত্যন্ত ভার

ভার ঠেক্‌ছিল। কত স্মৃতিবিজড়িত বাল্য এবং কৈশোর কালের এই তিনমহলার বড় বাড়ি।

আমার সেজ বোন বিমলা। আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। সম্পর্কে পিসি হলেও জয়ার সমবয়সী সে। জয়ার সঙ্গে তার খুব ভাব। বিমলারও বয়েস হয়েছে, তখনকার দিনে মেয়ের বয়স চৌদ্দ পেরুলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘুম থাকত না। চারদিকে পাত্রান্বেষণও চলছে। বিমলা গিয়ে বসেছে জয়ার বিয়ের আসরে।

বিবাহ-পর্ব শেষ হতে বেশি দেরি হল না। সান্ধ্যলগ্নে বিয়ে। নিমন্ত্রণ খাওয়া-দাওয়ার পালাও প্রায় শেষ-পর্বে এসে পৌঁচেছে। আমাদের আহারাদি শেষ হতে পিতৃদেব তাগিদ দিলেন,—এইবার আমাদের আহিরীটোলার বাড়িতে আবার ফিরে যাওয়ার পালা।

জয়ার বিশেষ আবদার এবং অনুরোধ বিমলাকে বিয়ের বাসর জাগতে হবে। পিতৃদেব রাজি হয়ে গেলেন।

সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি শ্যামবাজারের বিয়ের বাড়ির সামনে অপেক্ষারত। আমাদের পরিবারের সবাই একে একে উঠে বসলাম সেই গাড়িতে। কিন্তু আমার মা এখনো এসে পৌঁচ্ছেন না কেন?

আমিই মাকে খুঁজতে গেলাম।

কী আশ্চর্য! দেখলাম, মদনবাবুর বৈঠকখানা ঘরের পাশের প্যাসেজটায় আমার মার বুকে মুখ লুকিয়ে বুলিদি ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদছে।

মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, 'বুলি, তুই নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। বিধবা মেয়েরা পরাশ্রয়ী হলে অনেক কষ্ট পায়, স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার। পরগাছা হয়ে থাকার যন্ত্রণা তো টের পাচ্ছিস।'

আমার মার কথায় কী আশ্বাস লাভ করেছিল বুলিদি সেদিন তা বুঝতে পারি নি। ভূরিভোজে আর জয়ার বিয়ের আনন্দোৎসবের

মাঝে আমার মনে সেদিন কেমন এক ভৈরবীর করুণ সুর মূর্ছনাই বেজে উঠেছিল। বাড়ি ফিরে বিষণ্ণ মনে শুতে গেলাম, কিন্তু কিশোর চিত্ত বারে বারে কিসের এক বেদনার ভারে নিপীড়িত হয়ে রইল। সে রাত্রে সদ্য শেখা রবীন্দ্রসঙ্গীতের করুণ সুর বারে বারে আমার নিঃশব্দ কণ্ঠ সুরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগল,—

'জাগরণে যায় বিভাবরী'।

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' কবি শেলীর একথা আর্টের দিক্ থেকে সর্বতোভাবে সার্থক। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে নয়। তাই বুলিদির জীবনের খণ্ড-কথায় শুধু বেদনাই পরম রমণীয় হয়ে ওঠে নি। আর সেজন্যে আমার কিশোরজীবনের খেলাঘরের সংসারের একবেলার বধূকে জীবনোচ্ছল সার্থক বধূরূপে যেদিন দেখলাম সেদিন সত্যিই আনন্দ লাভ করেছিলাম। মাণিকের মতন ঈর্ষার তুষানলে দগ্ধ হই নি।

হঠাৎ দেখা আর একদিনের কাহিনী হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতনই আমার চোখকে ঝল্‌সে দিল। উত্তর কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আমার এক আত্মীয়াকে দেখতে এসে বাড়ি ফিরবার মুখেই হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৈশাখী বৃষ্টি নেমে এল। সঙ্গে বর্ষাতি কিংবা ছাতাও ছিল না। হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই প্রবল বর্ষণের কবলে পড়লাম, আশ্রয়লাভের জন্যে এদিক-ওদিক চাইছি, আর তখুনি একটি সবুজ রঙের ফীয়্যাট এসে আমার গতিরোধ করে দাঁড়ালো,—'কে, নীল না? শিগ্‌গীর উঠে আয়।'

মোটরের দরজা খুলে যে রমণী আমাকে তাঁর পাশে সাদরে বসালেন তিনি আর কেউ নন,—সবিস্ময়ে দেখলাম, তিনি আমার বুলিদি। দিব্যি গোলগাল ধরণের ভদ্রমহিলা, সম্ভ্রান্ত রমণীর মতন বেশভূষা।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি বুলিদি?'

'আপনি নয়, তুমি।'

'তুমি বুলিদি?'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ। এখানে কোথায় এসেছিলি?'

'এই হাসপাতালে।'

'কোন ওয়ার্ডে?'

'ফিমেল ওয়ার্ডে, আমার এক পিসিমার পুত্রবধূর অপারেশন হয়েছে।'

'এখন কেমন আছে?'

'ভালোই। আর দু'একদিনের মধ্যেই রিলিজ করে দেবে।'

বৃষ্টি খুবই জোরে নেমেছে। বৈশাখের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। ফীয়াট আবার আমাকে নিয়ে সেই হাসপাতালের গেটের মধ্যেই ঢুকলো।

বুলিদি বললে, 'আজকে আমার আসল বরকে দেখবি। মাণিকের মতন হিংসে করবি নে তো?'—তরল পরিহাসের সুরে বুলিদি মন্তব্য করলো!

আমি আশ্চর্য হয়ে বুলিদির মুখের দিকে তাকালাম। কণ্ঠস্বরে বুলিদির আর সেই পূর্বেকার খোনা সুর নেই। পরিষ্কার গলা। পরণে চওড়া পাড় সাদা শাড়ি, মুখে চোখে দিব্যি গৃহিণীপনার ভাব। মাথার কাপড় খোলা—সিঁথিমূলে সিঁদূরের রেখা, কপালে জলজ্বলে বড় লাল টিপ।

গাড়ি এসে থামলো ই. এন. টি ওয়ার্ডে।

বুলিদি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলে, 'সাহাবকো সেলাম দেও।'

ক্ষণকালের বিরতি।

অনুমানে বুঝলাম সাহাব হচ্ছেন বুলিদির বর্তমান কালের স্বামী। বিধবা বুলিদি তাহলে পুনর্বার বিবাহ করেছে।

মোটরের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসতে যাচ্ছিলাম। হাত ধরে বুলিদি আমাকে নিরস্ত করলে, 'আমরা তিনজনেই পাশা-

পাশি বসতে পারি। না হলে ডাক্তার সাহেবই ড্রাইভারের পাশে বসবেন।'

'তা কী হয় বুলিদি।'

'খুব হয়। তুই চুপ করে বস্ তো।'

অগত্যা চুপটি করে বাধ্য ছেলের মতন বুলিদির পাশে বসেই ডাক্তার সাহেবের অপেক্ষায় অপেক্ষারত হতে হল।

বুলিদি সহাস্যে বললে, 'খুব আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিস্—নারে কবিয়াল?'

বুলিদির মুখে কবিয়াল সম্ভাষণ শুনে অনুমান করলাম সেই আগেকার বুলিদিই আছে। শুধু একটু প্রগলভতার মাত্রা বেড়েছে এই যা। আর তা হয়ত বঞ্চিত এবং নির্যাতিত জীবনে কিছু না পাওয়ার পর হঠাৎ অনেক কিছু পাওয়াতে এই আনন্দোচ্ছ্বাস।

'কী রে কথা বলছিস্ নে কেন?' বুলিদি আমার কাঁধে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললো।

খানিকটা এইবার সচকিত হয়ে উত্তর দিলাম, 'কি শুনতে চাও বলো?'

'কাজকর্ম কিছু করছিস্, না কবিয়াল হয়ে বাউণ্ডুলিগিরি করছিস্?'

'চাকরি করছি।'

'কোথায়?'

'ব্যাঙ্কে।'

'তবে তো গণ্যমান্য ব্যক্তিরে! আচ্ছা, তোর নামে এক লেখকের কবিতা গল্প পড়ি মাঝে মাঝে। ডাক্তার সাহেবকে তখন সগর্বে বলি—এ লেখক আমাদের সেই কবিয়াল।'—বলে বুলিদি হেসে গড়িয়ে পড়লো।

'বিয়ে-থা করেছিস্?' বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বুলিদি আবার প্রশ্ন করল।

'না।'

'কেন রে, ব্যাঙ্কে চাকরি করিস, কবিতা-গপ্পো লিখিস। তুই তো খুব সৎ আর উপযুক্ত পাত্র রে।'

ঈষৎ পরিহাসের তরল সুর কণ্ঠে তুলে বললাম, 'আজকাল পাত্রীর বাজার খুব গরম। আর কে আমার বিয়ের জন্যে মাথা ঘামাতে যাবে বলো?'

'কেন মাসিমা, মেসোমশাই?'

বললাম, 'দুজনেই গত হয়েছেন।'

বাবার মৃত্যু সংবাদকে বুলিদি যেন সহজ ভাবেই গ্রহণ করলো, কিন্তু আমার মাতৃবিয়োগের কথায় বুলিদি যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—'মাসিমা নেই?'

'না। বাবার মৃত্যুর পরের বছরেই মারা গেছেন।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পালা। বাইরে বৈশাখী বৃষ্টি সমান তালে বর্ষিত হয়ে চলেছে। গাড়ির দরজা-জানলার কাঁচ বন্ধ করে আমরা দু'জন গাড়ির মধ্যেই বসে ছিলাম। ড্রাইভার এবং ডাক্তার সাহেবের দর্শন নেই। নিজেকে সামলে নিয়ে বুলিদি এইবার বললে, 'জয়ার বিয়ের দিন মাসিমা আমাকে নতুন জীবন পথযাত্রার নির্দেশ দেন। তাঁর কথাতেই প্রেরণা পাই।'

বুলিদি হাতের রুমাল দিয়ে ভিজে চোখ মুছে বললে, 'গুরুবাদ মানিস্?'

আশ্চর্য হয়ে গেলাম বুলিদির হঠাৎ এ-প্রশ্নে। হ্যাঁ, না, কিছুই বলতে পারলাম না।

বুলিদি বলতে লাগলো, 'তোর মা-ই আমার প্রকৃত গুরু। আমার নিজের মাসির বাড়িতে ভাত-কাপড়ের দাসী হয়েই ছিলাম। বিয়ে হল অজ পাড়াগাঁয়ে এক শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে। অনেকগুলি তাঁর পূর্বপক্ষের ছেলেমেয়ে। জমি-জমা, বিষয়-আশয় দেখে বিনা খরচায় আমার নিজের মাসিমা ঘাড়ের বোঝা নামাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বছর না ঘুরতেই আবার তাঁর সংসারে বোঝা হয়ে ফিরে এলাম। সেকথা

মনে আছে তোর—এয়োস্ত্রী এবং রূপ আর ঐশ্বর্যগর্বে গর্বিতা রমলাদি জয়ার বিয়ের দিন কী অপমানই না আমাকে করেছিল। তোর মা সেদিন পথ নির্দেশ না দিলে হয়ত শুনতিস গলায় দড়ি দিয়ে আমি আত্মহত্যাই করেছি। সে যে আরো পাপ রে নীল।'

বুলিদির কথায় একটা যেন সত্যিকারের গল্পের আস্বাদ পাচ্ছিলাম। প্রশ্ন করলাম, 'তারপর?'

'তারপর এই হাসপাতালে ই. এন. টির আউট ডোরে এক সহৃদয় ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হতে এসে ইনডোরে ভর্তি হয়ে যাই। সেই ডাক্তার আমার নাক এবং গলা অপারেশন করেন। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। শুধু তাই নয়, তাঁকে আমার জীবনকথা বলে প্রাইভেট নার্সিং শিক্ষার অভিপ্রায় জানাই। আর সে উপদেশ আমাকে দিয়েছিলেন তোর মা-ই।'

'তারপর?'

'তারপর আমার আবার নতুন করে যেন জন্ম হল। যে ডাক্তার আমাকে সারালেন, নার্সের চাকরি দিলেন, তাঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হল। পাঁচ বছর হল বিয়ে হয়েছে। উনি দ্বিতীয়পক্ষ, ওঁর পূর্ব বিবাহিত সুন্দরী স্ত্রী ওঁকে বঞ্চিত করে পরিত্যাগ করেছে। আর আমিও অকুলে কুল পেলাম।'

'তারপর?'

বুলিদি হাসতে হাসতে বললে, 'তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।'

নটে গাছটি মুড়োলো, গরুতে কেন খায়—এ প্রশ্ন তখনো বাকী ছিল। কিন্তু সে কথা শুনবার আর অবকাশ পেলাম না।

ছাতি হাতে ড্রাইভার এসে জানালে যে সাহেবের হাতে শক্ত কেস। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা হবে। সাহেব মেমসাবকে বাড়ি যেতে বলে দিয়েছেন।

বুলিদি কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়লো। নিজ প্রসঙ্গ ছেড়ে

আমাকে বললে, 'আহা এ মেয়েটির জীবন বড় রহস্যময় রে নীল। তোর গল্পের একটা ভালো প্লট হতে পারে। একদিন আসিস আমার বাড়ি। এই উত্তরাঞ্চলেরই কাছাকাছি।'

বুলিদি আমাকে ই. এন. টি স্পেশালিস্ট ডাক্তারের ভিজিটিং কার্ড দিয়ে বললে, 'এই নে, রেখে দে আমার ঠিকানা। কোথায় যাবি তুই এখন?'

সমস্ত ব্যাপারটিই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছিল। বললাম, 'আমি নেমে যাচ্ছি বুলিদি। পরে একদিন তোমার বাড়ি যাবো।'

বুলিদি এতখানি নির্দয় হতে পারলো না। বললে, 'আমি নেমে যাচ্ছি। পেসেন্টকে একবার দেখতে যাওয়া কর্তব্য আমার। ড্রাইভার তোকে তোর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে আবার এইখানে আসবে।'

আমি বাধা দিলাম, 'না, না, বুলিদি, সত্যিই কোন দরকার নেই। বরঞ্চ একটা বাসে উঠিয়ে দিলেই চলবে।'

বুলিদি আদেশের সুরে নির্দেশ দিলে, 'তা হয় না। এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কোন বাসে উঠবি? বর্তমান শহরের যান-বাহনের খবর রাখিস্ নে? আর তা ছাড়া—'

'তাছাড়া আবার কী?'

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে বসেছে। বুলিদি তার হাত থেকে ছাতাটি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে আমার কথার প্রত্যুত্তরে রসিকতা করে বললে, 'তা ছাড়া, তুই যে আমার প্রথম পক্ষের বর। বর-কনে খেলার সে কাহিনী কী ভুলে গেছিস্ নাকি? কিন্তু দোহাই কবিয়াল, সে-কথা যেন আবার লিখে ছাপিস নে।'

গাড়িতে স্টার্টিং-এর শব্দ শোনা গেল। চলন্ত গাড়ি থেকে লক্ষ্য করলাম ছাতি মাথায় বুলিদি হস্‌পিট্যালের ইনডোর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়েছে। আর আমিও শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে নেমে পড়ে দক্ষিণ কলকাতার একখানি বাসে চেপে বসলাম। ড্রাইভারের শত নিষেধ গ্রাহ্য করিনি।

॥ পাঁচ ॥

বিগতকালে শহর কলকাতায় ধনী পরিবারের বিয়ের বর এবং বরযাত্রীর শোভাযাত্রার যে সমারোহ, আধুনিক কালের বিয়েতে বাঙালি হিন্দু-পরিবারে সচরাচর এখন আর তা দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের শৈশব এবং কৈশোর কালে কলকাতা শহরে তার প্রাধান্য খুবই দেখা যেত।

চতুর্দোলার পুষ্পক রথ আলোয় আলোকময়। তার মধ্যে ভেলভেটের রাজসিংহাসনে রাজবেশ পরিহিত কৈশোরোত্তীর্ণ বর উপবিষ্ট। চন্দনচর্চিত ললাট ও কণ্ঠে ফুলমালা সুশোভিত, সামনে পিছনে বরযাত্রী। আলোয় আলোর বন্যা, নানাবিধ বাদ্যের সম্ভার। আতশবাজীর চমক। দীর্ঘ পথ জুড়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা। আহা, কী বাহার সে কালের জমকালো সেই বরের বিয়ে করতে আসার দৃশ্য! এখনো অবশ্য কলকাতা শহরে এ দৃশ্য দেখা যায়। তবে দেখা যায় উচ্চবিত্ত অপর হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ শোভ যাত্রায়।

বাঙালি বরের এ হেন একটি শোভাযাত্রায় সম্পূর্ণ অনাহূত এবং রবাহূত হয়ে আমরা দুই কিশোর কেমন করে মিশে গিয়েছিলাম এবং চর্ব্যচোষ্য আহারে পরিতৃপ্ত হয়ে আভিজাত্যের সম্মান লাভ করেছিলাম সে কৌতুককর কাহিনীটি আজো ভুলতে পারি নি। এখনো যখন বিধান সরণীর ঠনঠনে কালীবাড়ি পার হয়ে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের দিকে এগিয়ে চলি হঠাৎ কেন জানি নে কোনো এক বিবর্ণ প্রাসাদসম বাড়ির সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়াই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিগত কালের সেই সমারোহের বর-যাত্রীর শোভাযাত্রা।

দীর্ঘ প্রায় এক মাইল পথ জুড়ে সেদিনের সেই শোভাযাত্রা। কত রং-বেরং-এর আলোর মালা। হাতী, উট, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি, তুলোর হংসবলাকা, অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী এবং নানা প্রকার বাদ্যের সমারোহ। ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ এবং সানাইপার্টি, ঢাক ঢোলের বাজনা আর তার সঙ্গে খেমটা নাচের বাহার। পরিশেষে

রাজ-পোশাক পরিহিত বর এবং পাশে নিতবর, জুড়িগাড়ি, ফীটন এবং মোটরের মেলা—সে এক মহা সমারোহের দৃশ্য।

আমরা দুই কিশোর বন্ধু ফিরছিলাম ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে। আমি এবং আমার গ্রাম সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেন জগন্নাথদার জ্যেষ্ঠপুত্র। পাকাপোক্ত ছেলে, আমার চেয়ে বয়সে দু'চার বছরের বড়। এতদিন রমেন তার মেসোমশায়ের কর্মস্থল বিহারের এক রেল স্টেশনে ছিল।—রেলওয়ে স্কুলে পড়ত। মেসোমশায় আর শালিক-পুত্রের ভার নিতে রাজি নন—তাই রমেন ফিরেছে পিতৃআবাসে কলকাতার জোড়াবাগান পল্লীর দর্মাহাটা স্ট্রিটের এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে।

জগন্নাথদা বড়বাজারে চিনিপটিতে দালালীর কাজ করেন। দুই পুত্রের জনক—নিজে এবং তাঁর সহধর্মিণী আর তার সঙ্গে থাকেন তাঁর কনিষ্ঠ শ্যালিকা ও তাঁর স্বামী। তাঁরা নিঃসন্তান দম্পতি। জগন্নাথদা আমাদের গ্রামের লোক, নিকট প্রতিবেশী। গ্রাম সম্পর্কে আমার পিতৃদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার পিতৃদেবকে তিনি যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করেন।

আমরা তখন উত্তর কলকাতায় আহিরীটোলা বাবুরাম শীল লেনে থাকি। জগন্নাথদা এলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রমেনকে নিয়ে। রমেনের পড়াশুনা এবং স্কুলে ভর্তি করানোর সমস্যার সমাধানে পিতৃদেবের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

শ্যামল কিশোর ছেলেটিকে দৃষ্টির এক লহমায় দেখে নিলাম। আমার মা তখন সম্পর্কিত নাতিকে লুচি ভেজে খাওয়াচ্ছেন।

রমেনই প্রস্তাব উত্থাপন করলে, 'কেন আমি তো খুড়োর স্কুলেই ভর্তি হতে পারি। আমরা দু'জনে যখন একই ক্লাশের ছাত্র তখন ভালোই হবে বেশ কনসাল্ট করে পড়াশুনা কর যাবে।'

জগন্নাথদার আরো এক সমস্যা। জোড়াবাগান দর্মাহাটা স্ট্রিটের দোতলা বাসগৃহে মাত্র দু'খানি বড় বড় ঘর, আর রন্ধনশালা এবং

একটি ভাঁড়ার জাতীয় ছোট ঘর। এতদিন ছোট ছেলে ও ভায়রা-দম্পতি নিয়ে কম ভাড়ায় এইতেই চালাচ্ছিলেন, এখন বড় ছেলে আসাতে সে বাসা বাড়িতে স্থান অকুলানও বটে ; আরো কথা—তাঁর খুল্লতাত ভ্রাতা সম্প্রতি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন। খুল্লতাত বর্ধমান মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। সুতরাং তরুণ পুত্রকে কলকাতায় রেখে মেডিকেল পড়ানোও এক সমস্যা বিশেষ। জগন্নাথদাকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন অন্যত্র বেশি ভাড়ায় ভালো তিন চারখানা ঘরের একটি ভাড়া বাড়ি নিতে—সেখানে তাঁর ছেলেকে জগন্নাথদার অভিভাবকত্বে রাখা যেতে পারে।

দুটি সমস্যারই অচিরে সমাধান হয়ে গেল। বাবুরাম ঘোষ লেনে আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির দোতলা-অংশটির ভাড়াটিয়ারা সম্প্রতি উঠে গেছেন। চারখানা কামরা বিশিষ্ট সেই দ্বিতল অংশটি জগন্নাথদা তখুনি ভাড়া নিতে রাজী হয়ে গেলেন এবং স্থির হল রনেন আমাদের স্কুলেই আমাদের ক্লাশে ভর্তি হবে।

বিডন স্ট্রিটেই শ্যামাচরণ ইনস্টিটিউশন থেকে ট্রান্সফার নিয়ে আমি ভর্তি হয়েছি হেদুয়ার কাছাকাছি সদ্য প্রতিষ্ঠিত আর একটি স্কুলে—নাম নিমাই অ্যাকাডেমি। ছোড়দা ভর্তি হয়েছেন বাগবাজারে শৈলেন সরকারের স্কুল সরস্বতী ইনস্টিটিউশনে—উত্তর কলকাতার খ্যাতি সম্পন্ন বিদ্যায়তন। মা খুব খুশি। কিন্তু আমার গ্রহের ফের কাটে নি। তাই আমি ভর্তি হলাম নিমাই অ্যাকাডেমিতে। নিমাই অ্যাকাডেমির হেডমাস্টার এবং প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত নলিনী দে মশায় আমাদের গ্রামবাসী। উত্তর কলকাতার ভবতারণ ইনস্টিটিউশনের ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় বিডন স্ট্রিটে বেথুন স্কুলের বিপরীত দিকে একটি বাড়িতে স্কুল ও তৎসংলগ্ন ছাত্র হোস্টেল খুলে জাঁকিয়ে বসেছেন। নলিনীবাবুর সাগ্রহ অনুরোধে মাতৃদেবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই স্কুলে আমি ভর্তি হলাম ফোর্থ ক্লাশ অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীতে। কয়েক মাসের মধ্যে আমার

সহপাঠী হয়ে এলো রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনায় সোহাগা যেন। আমি রমেনের খুড়োমশায় আবার বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে রমেনও আমার খুড়ো। দু'জনে হরিহর আত্মা। একই শ্রেণীতে পড়ি, পাশাপাশি বাড়িতে থাকি।

আমি বাল্যাবধি কলকাতাতেই মানুষ—সেক্ষেত্রে রমেন খুড়ো বিহারের দেহাতী। কিন্তু রমেনখুড়ো অনেক বিষয়ে আমাপেক্ষা সুপরিপক্ক। খুড়োর অনেক বুদ্ধি আর অনেক গুণ, সেক্ষেত্রে আমি নাবালক শিশুই। খুড়োর পকেটে নিত্যই দু'চার আনা পয়সা এমন কী টাকাটা সিকিটা থাকে—আমার পকেট রিক্ত। খুড়ো পথ চলতে চলতে চট করে ট্যাটলার এবং হাতী মার্কা সিগরেট ধরায়, হুসহুস করে টানে। তারপর নেবুর পাতা এলাচ আর দারুচিনি চিবিয়ে মুখ থেকে ধূম পানের গন্ধ নাশ করে—আমি ভয়ে দু'চার টান মেরে শুধু খক্‌খক্ করে কাশতে থাকি।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসা যাক।

নিমাই অ্যাকাডেমির একজন শিক্ষক—নিতাইবাবুর বিয়ে। নিতাইবাবু আমাদের বিশেষ প্রিয় শিক্ষক—তিনি ছাত্রাবাসেই থাকতেন। ছাত্রাবাসে আমার অবাধ গতি ছিল। নিতাইবাবু বিশেষ করে আমার গানের তারিফ করতেন। হোস্টেলে প্রায়ই আমি গান গাইতাম আর রমেন খুড়ো গিরিশ ঘোষের সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসারের সেই অনবদ্য নাট্য কাব্যাখান অ্যাক্টিং করে শোনাতো। রমেন খুড়ো ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়পটু। বর্তমানে সে রঙ্গালয় থেকে যাত্রা জগতে খ্যাতি অর্জন করেছে। নিতাইবাবু তাঁর বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়ার জন্যে আমাদের দু'জনকে নিমন্ত্রণপত্র দিলেন। আমরা তো চরিতার্থ—খুশীতে ডগমগ।

মা প্রথমে রাজি হন নি—'অত দূরে যাওয়া-আসা, না, তা সম্ভব নয়।'

বিয়ে হবে কলকাতার অনতিদূরে চব্বিশ পরগণার বেলঘরিয়া

অঞ্চলের নিমতা গ্রামে। তখন কলকাতার পথে এতো বেশি বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি—বিশেষ করে কলকাতার বাইরে মফঃস্বল গ্রাম-গঞ্জ। অতএব ট্রেনই সম্বল।

রমেন খুড়ো তার গ্রাম সম্পর্কিত ঠাকুরমাকে অনেক বোঝালে—মাস্টার মশাই নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদের যাওয়া-আসার সুব্যবস্থার। আর তাছাড়া হোস্টেল শুদ্ধু ছেলেরা এবং অন্যান্য মাষ্টার মশাইরাও যাচ্ছেন। তাই, আশঙ্কার কোন কারণ নেই।

মাতৃদেবী সম্মতি দিলেন।

কথা ছিল স্কুলবাড়ি থেকেই সবাই আমরা একযোগে যাবো। যদি কোন রকমে সবাই ঠিক সময়ে পৌঁছাতে না পারি তা হলে শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনে গেলেও চলবে। বিকেল পাঁচটায় ট্রেন। বিয়ে গোধূলি লগ্নে।

আমার সাজ-পোশাকে বিলম্ব ঘটে নি। কিন্তু যত গোল বাধালে রমেন খুড়ো। কালো ফিতে পাড়ের কোচানো কাঁচি ধুতি আর ফুলকাটা সিল্কের পাঞ্জাবী আর স্নো-পাউডারের প্রলেপে মুখের সাজ-সজ্জায় রমেন খুড়ো এত বিলম্ব ঘটালো যে আমাদের স্কুলে যাওয়া তো ঘটলোই না, এমন কী পড়িমরি করে শিয়ালদহ নর্থ স্টেশনে গিয়েও দেখলাম—নির্দিষ্ট ট্রেন তার আগেই স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। হা হতোস্মি! তেলে বেগুনে রমেন খুড়োর ওপর চটে গিয়ে ভর্ৎসনা জানালাম—'এখন উপায়?'

রমেন খুড়ো পকেট থেকে এক প্যাকেট ট্যাটলার সিগারেট এবং নগদ দুটি চকচকের রূপোর টাকা বের করে আশ্বাস জানালে—'ঘাবড়াও মাৎ।'

অর্থাৎ সিমলা অঞ্চলের উৎকল খাদ্য ভাণ্ডারের গরম পরোটা আর ধোঁকার ছক্কা তার সঙ্গে খাজা-গজা—এক টাকাও হয়ত দাম পড়বে না। তার সঙ্গে বেনারসী পানওয়ালার খাঁটি পান আর ট্যাটলার সিগারেট—বরযাত্রীর ভোজ থেকে কম কিসের?

অগত্যা তাই।

কিন্তু রমেনখুড়ো তখনকার কালের মহার্ঘ দু'টাকা সংগ্রহ করলো কি করে? রমেনখুড়ো সে সম্পর্কে বললে, 'চুপ কর! অতো তে তোর দরকার কী?'

তবু আমার আশঙ্কা যায় না।

রমেনখুড়ো মুচকি হেসে বললে, 'নবযুবকের হাতবাক্স থেকে সরিয়েছি।' নবযুবক অর্থে হবু ডাক্তার তার জ্যোতিকাকা।

বললাম, 'কী সর্বনাশ। বাড়ি ফিরলে তাহলে তো তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে।'

'দূর! নবযুবক এখন ফুর্তিতে ডগমগ—দু'চার টাকার হিসেব রাখে না। মাঝে মাঝে দু'চারবার নিয়েছি—টেরও পায় নি। আর টের পেলেও আমাকে সন্দেহ করবে না। আমার ভাই খগেনকেই ধরবে। খগেন মেসোমশাই-এর পকেট মারতে গিয়ে দু'একবার ধরা পড়েছে।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল তবুও।

শিয়ালদহ সাউথ স্টেশনের পাশে তখন বহু বিস্তৃত ধোপার মাঠ—সেখানে ছোট একটা জলাধার। সেই জলাধারের পাশে দুই কিশোর বন্ধুতে গিয়ে বসলাম। গ্রীষ্ম অপরাহ্ন। অস্তমান সূর্যের লাল আভা পশ্চিম আকাশকে রাঙিয়ে তুলেছে।

'শালা নিতাই মাস্টার। বৌ যেন পালিয়ে যাচ্ছে। একটু কী তর সইছিল না?'—রমেনখুড়ো সরোষে মন্তব্য করলো।

'তুই তো দেরী করলি?'

আমার কথায় রমেনখুড়ো খেঁকিয়ে উঠলো, 'দেরী করলি? আমি কী ইচ্ছে করে করেছি? নবযুবক কলঘরে না ঢুকলে হাত সাফাই করি কী করে বল?'

'আজ আর হাত সাফাই-এর দরকার কী ছিল?'

'তুই একটা আস্ত গবেট। নাঃ, তোকে আর মানুষ করতে

পারলাম না।' রমেনখুড়ো আফশোষের সঙ্গে ট্যাটলারের প্যাকেট ছিঁড়ে একটা সিগারেট নিজে ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটি মেলে ধরলো।

সিগারেট তখন তিক্ত—নৈশ আহারের চিন্তাটাই প্রবল। কিন্তু রমেন খুড়োর এর জন্যে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই।

শিয়ালদহ সাউথ রেলওয়ে স্টেশনের পাশে ধোপার মাঠের জল ধারায় সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি। নাঃ, আর বসা গেল না। বেলেঘাটা অঞ্চলের পনপনে মশার ডাকে আর কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যেন।

'শালা নিতাই মাস্টারের বিয়ের নিকুচি করেছে—চল ওঠা যাক।' রমেনখুড়ো জ্বলন্ত ট্যাটলার সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তা জলে ফেলে দিলো।

পদব্রজেই দু'জনে শিয়ালদহ থেকে হ্যারিসন রোড ধরে এগিয়ে এসে কলেজ স্ট্রিটের জংশনে পৌঁছালাম।

'চল, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধরে হাঁটি। হেদোর কাছে সিমলে পাড়ায় উড়ের দোকানে ভালো পরোটা ভাজে আর ধোঁকার ছক্কাও করে চমৎকার।'

রমেনখুড়োর কথায় সম্মত হলাম—অগত্যা, তাই। নাকের বদলে নরুণ আর কী।

কিছুটা পথ অতিক্রম করতেই দেখলাম ট্রাম, গাড়ি, যান-বাহন সব কিছু বন্ধ। সামনে এক আলোক সজ্জায় সজ্জিত এবং নানা বাদ্য মুখরিত বর-শোভাযাত্রা।

ব্যাণ্ড বাজছে ভোঁপোর ভোঁ ভোঁপোর ভোঁ, জগঝম্পর ঝমঝম শব্দ, ব্যাগপাইপের বাজনার বাহারই বা কি! আর শানাই পার্টিও এগিয়ে পিছিয়ে সন্ধ্যার সুর ধরেছে। আলোক রোশনাই—আতস-বাজীর খেলা, বরযাত্রীর বিরাট দল—গলায় হাতে ফুলের মালা। বর তখনো অনেক দূরে। চলার গতি থামিয়ে রমেনখুড়ো বললে, 'হল্ট্'!

'কেন রে ?'

খুড়ো ফুলকাটা সিল্কের পাঞ্জাবীর পাশ পকেট থেকে রেশমী রুমাল বের করে নাকের ডগার সামনে দু'চার বার হাওয়ায় উড়িয়ে দিলো। সেন্টের ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো নাসারন্ধ্রে—'চল বরযাত্রীর দলে মিশে যাই।'

'সে কী রে!'

'কেন, ভয়টা কিসের ? কেই বা চিনছে আর কেই বা জানছে ?'

'যদি ধরে ফেলে ?' আমি সভয়ে উক্তি করলাম।

'দূর গাধা! বরপক্ষ মনে করবে কনেযাত্রীর লোক আর কনেপক্ষ মনে করবে বরযাত্রী।'—রমেনখুড়ো বুক ঠুকে বললে, 'এমন অনেক কেস আমার জানা আছে।'

অনতিদূরে বড় বাড়ির বড় ফটক—আলোর বন্যায় সারা বাড়িটা ভাসছে। আর নানা রং-এর বিজলী টুনি বাল্ব গাছের লতায়-পাতায়, জলের ফোয়ারায়—ছাদের কার্নিসে, অলিন্দে অলিন্দে। বন্দুকধারী গার্ড প্রবেশপথের বড় ফটকে। শানাই সুমধুর তান ধরেছে—উলু আর শঙ্খধ্বনিতে গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখরিত।

ব্যাণ্ডপার্টি বিয়ে বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে—ভোঁপোর ভোঁ, ভোঁপোর ভোঁ! রমেন খুড়ো সোৎসাহে বললে, 'কি গান বাজাচ্ছে জানিস ?'

নিজের অজ্ঞতাকে প্রকাশ করলাম।

খুড়ো অবজ্ঞার কণ্ঠে মন্তব্য করলে, 'ছাই গান জানিস তুই। এ সুরটা আর ধরতে পারলি নে ?'

'না ভাই।'

'শোন তবে, মোস্ট কমন বিয়ের সুর।' ফুলকাটা পাঞ্জাবীর পাশ পকেট থেকে আর একবার রেশমী রুমাল বের করে ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ ছড়িয়ে রমেনখুড়ো বেসুরো কণ্ঠে গান ধরলো—

'ঘটা করে বর এসেছে, বলে গেছে ইশারায়!'

দেখা হবে ছাঁদনা তলায়।'

সত্যিই ব্যাণ্ড পার্টির বাদ্যস্বরের ভোঁপোর ভোঁ ভেঁাপোর ভেঁা-এর সঙ্গে 'ঘটা করে বর এসেছে' সুরের কী অপূর্ব সৌসাদৃশ্য!

বিয়ে বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। বরযাত্রীর দল ঢুকছে বিয়ে বাড়িতে। ওপর থেকে গোলাপ জল আর আতরের জল পিচকিরি দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভ্যাগত নিমন্ত্রিতজনের মাথায়। তার খানিকটা সিঞ্চন্ আমাদের মাথা ও গা স্পর্শ করলো।

খুড়ো এগিয়ে গিয়ে সেই শোভাযাত্রীর দলে মিশে গেল। আমাকে বলে গেল, 'ফলো মী।'

কিন্তু আমি তা পারলাম কই? দু'পা এগুতেই ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম গেটের পাশেই।

রমেনখুড়ো ঢুকে পড়েছে। আমার অবস্থা কাহিল। গিলে করা সাদা পাঞ্জাবীর পকেটে মাত্র মায়ের দেওয়া পয়সা কয়েক আনা মাত্র। সিমলার উৎকল আহারশালার গরম পরোটা আর ধোঁকার ছক্কা, তাও আজ আর কপালে নেই দেখছি।

ব্যাণ্ড বাজছে ভোঁপোর ভোঁ, ভোঁপোর ভোঁ, কিন্তু আমার মনে আর সুর জাগছে না,—'দেখা হবে ছাঁদনা তলায়।' কিছুক্ষণের মধ্যেই খুড়ো মশলাদার মিঠে পান চিবুতে চিবুতে গেট পার হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো—হাতে তার কাগজের রুমালের সোনালী অক্ষরে ছাপা বিয়ের পদ্য।

'কী ফাস্ট কেলাস বিয়ের পদ্য দেখ মাইরি। আহা কী মিল। বরের নাম বারিদ আর কনের নাম সৌদামিনী। একেবারে রাজ যোটক।'

খুড়োর কথা তখন আর ভালো লাগছে না। 'এরই মধ্যে খেয়ে এলি?''

'দূর, তোর জন্য সবাই অপেক্ষা করছে না! চল, চল'—বলে

রমেনখুড়ো আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে বিয়ে বাড়ির দ্বারের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

তবু কী ভয় যায়? গা-হাত-পা কাঁপছে যেন। যদিও বন্দুকধারী প্রহরীদের সীমানা পার হয়ে এসেছি, কিন্তু বরপক্ষ এবং কনেপক্ষের এই লোকজন! যদি কেউ এসে প্রশ্ন তোলে, 'কোত্থেকে আস ৷হচ্ছে হে ছোকরা?'

কী জবাব দেব সেক্ষেত্রে?

· খুড়োর মুখে কিন্তু কোন ভয় বা সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নেই। সারিবদ্ধ চেয়ারের একটিতে বসে ঘন ঘন রেশমী রুমাল উড়াচ্ছে আর সানন্দে পা নাচাচ্ছে।

এতক্ষণে বর এসে পৌঁচেছে। চতুর্দোলার রাজসিংহাসন ছেড়ে আর এক সম্রাটের রাজসিংহাসনে বসেছে। তরুণ সুকুমারকান্তি আঠার উনিশ বছরের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণের বর সত্যিই যেন রাজকুমার—যুবরাজ। চন্দনচর্চিত ললাটে বিদ্যুতের ছটা, আহা মেঘের সঙ্গে সৌদামিনীর শোভা—কী অপরূপ সৌন্দর্যই না ধারণ করবে।

ফার্স্ট ব্যাচেই খুড়ো উঠে পড়লো। আমারও কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে টেনে তুললে, 'ওঠ, এই ব্যাচেই খাওয়া সেরে নেওয়া যাক।'

সিঁড়ির চত্বরে শুধু আলো, আলপনা আর ফুল আর ফুল। মেহগনি কাঠের প্রশস্ত কালো সিঁড়িতে কী চকচকে পালিস। তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে চার তলায় উঠলাম। ছাদ তো নয় যেন গড়ের মাঠ। ওপরে শামিয়ানার ঝালর। নানা রঙের রেশমী কাপড়-মোড়া আচ্ছাদন ঘিরে শুধু ফুলের ঝাড়, ঝাড় লণ্ঠন আর রঙের ফোয়ারা। বন বন করে বিজলী পাখা ঘুরছে—চারদিক থেকে সুগন্ধ ঝরে ঝরে পড়ছে। প্রকাণ্ড বড় বড় মাটির থালা—তার চারপাশ ঘিরে কত কত মাটির বাটি আর গেলাস। নানা রকমের ফল, লুচি, পোলাও, রাধাবল্লভী, কচুরি, সিঙাড়া থেকে আরম্ভ করে মাছের ফ্রাই, ডিমের ডেভিল, মাংসের চপ, রুইমাছের মুড়িঘণ্ট, কালিয়া, কোপ্তা এবং

পরিশেষে কত রকমের চাটনি, আদার কুচি, পাঁপড় ভাজা, দই, রাবড়ি, ক্ষীর, পেঁড়া, সন্দেশ, রাজভোগ, পান্তুয়া—আরো ,কত কত মিষ্টি। সেদিনের ভোজ কেন, আজও মনে করতে পারিনে পরবর্তী জীবনের দীর্ঘ নিমন্ত্রণ ভোজেও এমন মহার্ঘ আহার আর কখনো ভাগ্যে জুটেছে কিনা।

কিন্তু এ আহার-সুখ ও পরিতৃপ্তি প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারছি নে, সব সময়েই যেন 'এই ভয় ওঠে মনে এই ভয় ওঠে'—অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের কেউ বুঝি এসে প্রশ্ন করে, 'ওহে ছোকরা—তুই কে বটে রে!'

না, সে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটে নি। তাই সুখাদ্য আহারের পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে তুলতে উঠে পড়লাম। এবং আমন্ত্রিত-জনেদের সঙ্গেই আহারের পর গোটা কয়েক সুগন্ধী মিঠে পান চিবুতে চিবুতে আবার তিনতলার প্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি ও চত্বর ভেঙে নিচে নেমে এসে সমারোহপূর্ণ বিবাহ-সভায় সমুপস্থিত হলাম। লগ্নও সমাগত। বারিদবরণ এবার সৌদামিনীর মুখচন্দ্রিমা দর্শন করবেন। লোকে লোকারণ্য—ঘন ঘন উলু আর শঙ্খধ্বনি, সানাই এর বিলম্বিত টোরি রাগ এবং সেই ব্যাণ্ড পার্টির ভোঁপোর ভোঁ ভোঁপোর ভোঁ ধ্বনি। এবার যেন স্পষ্ট ইঙ্গিত, 'দেখা হবে ছাঁদনা তলায়।'

বিয়েবাড়ির গেটের বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। নাঃ, আর ভয় নেই। ঠনঠনিয়া কালীতলা পৌঁছে গেছি। রমেন খুড়ো তখন আহ্লাদে আটখানা। মিঠে মশলাদার পান চিবুতে চিবুতে ঠোঁটের আগায় ট্যাটলার সিগরেট ধরিয়ে খুড়ো গান ধরেছে—

'মনের সাধ মিটল এত দিনে—'

যুঁই-এর পাশে গন্ধরাজ। এ কী শালা তোর নিতাই মাস্টার রে! কী ভোজ মাইরি!'

খুড়োর কথায় সমর্থন জানালাম।

ট্যাটলারে আমার আর রুচি নেই। অমন রাবড়ি ক্ষীরের স্বাদ-

ভরা রসনাকে সিগরেটের ধোঁওয়ায় তিক্ত করতে মন আর চাইছে না। এইবার বাড়ি ফেরা দরকার।

খুড়ো বললে, 'দূর, এত তাড়াতাড়ি কেন? নিতাই মাস্টারের বিয়ের জন্যে কাল তো ইস্কুলের ছুটি। এরই মধ্যে বাড়ি ফিরলে তো আবার ঝুট ঝঞ্ঝাট সুরু হবে। চল হেদোয় গিয়ে খানিকক্ষণ বসি গে।'

রমেন খুড়ো ফুলকাটা পাঞ্জাবীর পাশ পকেট হাতড়ালে, 'নাঃ, ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে রে?'

'খান কতক কড়াপাক তালশাঁস ঝেড়েছি।'

'মানে?'

আমার বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে খুড়ো বললে, 'সিমলের নকুড়ের কড়াপাক তালশাঁস সন্দেশ রে।'

'কি করে নিলি?'

খুড়ো গর্বের হাসি হেসে বললে, 'একেই বলে হাত সাফাই। কেন বিয়ে বাড়ির খাবারের পাত থেকে।'

আশ্চর্য চোখে খুড়োর মুখের দিকে তাকালাম।

'কার জন্যে জানিস?'

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি।

খুড়ো ছ' কানের কাছে মুখ এনে চুপি স্বরে বললে, 'আমার সৌদামিনীর জন্যে।'

ইঙ্গিতটা বুঝলাম। রমেনখুড়ো কিছুদিন ধরে তাদের বাড়ির একতলার অধিবাসিনী কিশোরী কুমারী মেয়ে লবঙ্গের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

লবঙ্গ ঘটিত অনেক কথাই খুড়ো আমাকে প্রতিদিন শোনায়। এমন কি একদিন স্কুলের পথে রুলটানা কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালো পেন্সিলে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরের লেখা প্রেমপত্রের নমুনাও আমাকে দেখিয়েছে—সাড়ে চুয়াত্তর দিব্যি দেওয়া চিঠি।

কিন্তু বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ অনেক। খুড়ো হয়ত তখন তা জানতো না। জানলে বুঝি নিমন্ত্রণের পাত থেকে অমন করে হাত সাফাইয়ের ঝুঁকি সেদিন নিতো না। সে কথা একদিন প্রকাশ্যেই সে আমাকে আফশোষ করে বলেছিল।

এ ঘটনার মাস দুয়েক পরেই লবঙ্গলতা এবং রমেনের প্রণয়ে ছেদ পড়ে। লবঙ্গ বাপের এক মেয়ে। বাপ মধ্যবিত্ত আয়ের মার্চেন্ট অফিসের কেরানি হলেও লবঙ্গকে সোনা-দানা দিয়েই সুপাত্রে পাত্রস্থ করে ছিলেন। লবঙ্গলতার বয়স তখন মাত্র তের পার হয়েছে। তবু গৌরীদান বলা যায় না। কেননা, আমাদের বাল্যকালে দেখেছি দশ এগার বছরের গৌরীদানের দৃশ্য।

বিয়ের আগেই কেন জানিনে লবঙ্গলতার পিতা বাড়ি পাল্টে আহিরীটোলার বাবুরাম শীল লেন থেকে মধ্য কলকাতার শিয়ালদহ পল্লীর সুরী লেন-এ উঠে এলেন। আর মেয়ের বিয়েতে এমন কী এত পরিচিত জগন্নাথদাকেও নিমন্ত্রণ জানালেন না।

খুড়ো কিন্তু আঁকা-বাঁকা হাতের লাইন টানা কাগজের শেষ চিঠি পেয়েছিল লবঙ্গলতার কাছ থেকে—'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন গো ভোলে মোরে।'

অমন জবরদস্ত রমেনখুড়ো এ চিঠি পেয়ে ভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। আফশোষ করে আমাকে বলেছিল, 'দুর শালা, মেয়েরা ভারি বেইমান। তুই তো স্বচক্ষে দেখেছিলি খুড়ো, কী কাণ্ড করে সেদিন তালশাঁস সন্দেশ এনেছিলাম লবঙ্গের জন্যে।'

আর লবঙ্গের বিয়ের পর রমেনখুড়োকে অন্য কোন মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হতে দেখি নি আমরা। অবশ্য বাপের মনোনীত পাত্রীকে যথাসময়ে বিয়ে করা ছাড়া।

পাশ পকেটের সন্দেশ, খান দুই বিয়ের রুমাল পত্রে মোড়া। পাছে গুঁড়িয়ে না যায় তার জন্য রমেনখুড়ো খুবই সাবধানে পথ চলতে লাগলো।

আমি বললাম, 'তা হলে আর হেদোয় বসে কাজ নেই।'

'কেন? কতই বা আর রাত হয়েছে?'

খুড়োর কথায় বললাম, 'লবঙ্গ হয়ত ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

'তা যা বলেছিস মাইরি! তবে চল একটা রিক্সা নিয়ে বাড়িই যাই।'

রিক্সায় উঠে রমেনখুড়োকে সাবধান বাণী শোনালাম, 'লবঙ্গর সঙ্গ ছাড়। এ বয়েসে উচিত নয় এ সব কাজ করা।'

খুড়ো ক্ষেপে উঠলো, 'তুই বড়ো নীতিবাগীশ। কেন, অন্যায়টা কিসের? ম্যাট্রিকটা পাশ করেই একটা চাকরি-বাকরির যোগাড় করে আমি ওকে বিয়ে করবো।'

'হ্যাঁ, তদ্দিন ওর বাবা ওর বিয়ে না দিয়ে তোকে জামাই করবার জন্যে বসে থাকবে।'

'ওর বাবা বসে না থাকলেও লবঙ্গ থাকবে। মা কালীর নামে দিব্যি গেলে ও আমাকে এ কথা বলেছে।'

'বলিস কী?'

বিজয়ীর গর্বে হেসে খুড়ো বললে, 'হ্যাঁরে, হ্যাঁ। সত্যি, সত্যি, সত্যি। এই তিন সত্যি করে বলছি—লবঙ্গ বলেছে আমাকে।'

বলতে দ্বিধা নেই রমেনখুড়োর এ সৌভাগ্যে সেদিন ঈর্ষাকাতর হয়েছিলাম দস্তুরমতো।

চলন্ত রিক্সায় বসে খুড়ো পরমানন্দে পা নাচাচ্ছিল আর ফন্দী আঁটছিল বাড়ি গিয়ে নিতাই মাস্টারের বিয়ের নিমন্ত্রণের কথা কেমন সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে। আমাদের দু'জনের কথা যেন একই ধরণের হয়। অর্থাৎ কনে কেমন হল, কি কি খাওয়ার আয়োজন করেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি।

খুড়োর কথার রিহার্সাল দিলাম বার কয়েক। দুজনেই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে বে-ফাঁস কোন কথা পরস্পরের মুখ থেকে বের হবে না।

বিডন স্ট্রিট পার হয়ে চিৎপুরের জংশনে এসে পৌছাতে রিক্সা ছেড়ে

দিলাম। এমন বাড়তি পয়সা কোথেকে পেলাম এ সন্দেহ বাড়ির অভিভাবক অভিভাবিকাদের মনে জাগতে পারে তাই এইখানে নেমে পড়াই ভালো।

রিক্সা থেকে নামতেই রাস্তার উজ্জ্বল আলোকে রমেনখুড়োর পায়ের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম, খুড়োর পায়ে চকচকে বার্ণিশ করা এক জোড়া নতুন পাম্পসু।

'এ কী রে?'

হাসতে হাসতে রমেনখুড়ো বললে, 'দেখলাম, পায়ে বেশ ফিট করেছে।'

'বাড়িতে কিছু বলবে না?'

'বললে বলবো, কী করবো? আমার জুতো কে পরে গেছে। আমি কী খালি পায়ে বাড়ি ফিরবো নাকি?'

আজ থেকে কতকাল আগেকার এক কৌতুককর কাহিনী। কলকাতা শহরে বনেদী পরিবারের সে আভিজাত্য আজ আর বড় তেমন করে আর চোখে পড়ে না।

অবশ্যই জাঁক জমকের বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘাটতি কিছু নেই শহর কলকাতায়। কিন্তু ঠনঠনে কালীতলা পার হয়ে যখনই সেই বড় প্রাসাদসম বাড়িটির গেটের সামনে আসি, ক্ষণকালের জন্যে আমার পথ চলার গতি মন্থর এবং স্তব্ধ হয়ে আসে।

একালেও আলোয় আলোময় বিয়ে বাড়ি দেখি, বরের মোটরের পুষ্পসজ্জাও দেখলে চোখ জুড়োয়। মোটর আর মোটরের সারি, রিজার্ভড বাস, মিনিবাস ভর্তি নানা সাজে সজ্জিত পুরুষ নারী বরযাত্রী-যাত্রিনীর শোভাযাত্রা আছে। শানাইয়ের ইমন রাগের পাশে জাজ মিউজিকের ধ্বনিও সাড়ম্বরে ঘোষিত হয়। মাইক, পুলিশ, ব্যস্ত সমস্ত ভাব, এ সবের অভাব নেই।

কিন্তু কোথায় সেদিনের সেই ব্যাণ্ড পার্টির ভোঁপোর ভোঁ

ভোঁপোর ভোঁ বাদ্যসঙ্গীতের মধ্যে সেই বিবাহ-সঙ্গীতের সুরধ্বনি, 'ঘটা করে বর এসেছে, বলে গেছে ইশারায়, দেখা হবে ছাদনা তলায়।'

॥ ছয় ॥

সমুদ্রদর্শন আমার জীবনে কৈশোর কালেই ঘটেছিল।

সে আজ কতকাল আগের কথা। তখন সমুদ্রবেলাভূমিতে এত লোকের ভিড় থাকতো না। এত ঘরবাড়ি, আশ্রম, হোটেল প্রভৃতির সমারোহও ছিলনা। কিন্তু এখন যেমন পুরী এক্সপ্রেস থেকে নেমে সমুদ্র-সৈকতে 'হোম', 'আশ্রম' বা 'হোটেলে' আসতে হলে পুরীর সমুদ্রের খানিকটা কাছাকাছি এসেই মোটর, ট্যাক্সি কিংবা সাইকেল রিক্সার গতিপথে দৃষ্টির এক লহমায় সমুদ্র দর্শন মেলে,—নীল নীল জলরাশি, সাপের ফণা উঁচানো ঢেউ-এর মাথা আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ যতবারই দেখা যাক্ না কেন, প্রতিবারই দর্শকমনকে টানে,—আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের কিছুকাল আগেও এইপথে আসবার কালে তেমনি ভাবে টেনেছিল এক কিশোর-চিত্তকে। বালির তটভূমিতে ঝাউ-এর দোলার শব্দে যে মর্মরিত গুঞ্জন, তাকে চাপা দিয়ে সমুদ্র-গর্জন ত্রাসের সঞ্চার না করে বরঞ্চ কেমন যেন একটা আকর্ষণের ভাবকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিল দশ-এগারো বছরের কিশোর-চিত্তকে।

ট্যাক্সি নয়,—সাইকেল রিক্সার প্রবর্তনও তখন ঘটে নি। ছৈ-দেওয়া গো-যানের মধ্যে বসে প্রথম সমুদ্র দেখার অনুভূতি আজ পরিণত বয়সে বহুবার সমুদ্রদর্শনেও পুরানো হয়ে যায় নি।

ভারতের, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে সমুদ্রকে দেখেছি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে। পশ্চিমবঙ্গের দীঘাও মনকে আকৃষ্ট করেছে, —কিন্তু না, পুরীর সমুদ্রের ধারে কাছেও নয়—এ নিয়ে রীতিমত একটা তরজার গাওনাও গেয়েছি সুপ্রসিদ্ধ কথাকার, বিচিত্রা এবং গল্পভারতীর ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে উপীনদার সঙ্গে। কিন্তু তবু কেন না জানি পুরীর সমুদ্র আমাকে সমধিক টানে। তা কি জীবনের প্রথম সমুদ্রদর্শনের আবেগে?

বোম্বাই, ওয়ালটিয়ার, গোপালপুর-অন-সী, মাদ্রাজের সমুদ্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু রামেশ্বরমের সেতুবন্ধ, মহাবল্লীপুরম্-এর দুর্ধর্ষ সমুদ্রের ডাক এবং কন্যাকুমারিকায় তিনটি মহাসমুদ্রের সঙ্গমস্থান, সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত বিবেকানন্দ রক—সমুদ্রাভিসারী মনকে গভীর থেকে গভীরে, তল থেকে অতলে টেনে নিয়ে গেলেও উড়িষ্যার পুরীর নীল সমুদ্র আমাকে বার বার আহ্বান জানায় যেন, তার এবং একটা আলাদা আকর্ষণকে প্রতিবারই আমি অনুভব করি। ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাসোসিয়েশন,—সেই কবেকার কিশোর কালের এক রম্য-আকর্ষণ তত্ত্বাভিসারী কিংবা কাব্যানুসন্ধানী ভাবগভীর জীবনদর্শন নয় তা বেশ অনুভব করি, তাই প্রতিবারই পুরীর সমুদ্র-বেলাভূমিতে গেলে সমুদ্রের সঙ্গে আরো একটি স্থানের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় মন আমার ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই স্থানে দাঁড়িয়ে আমি আবার আমার বিগত কৈশোরকালকে ফিরে ফিরে পাই। এই ফিরে ফিরে চাওয়ার একদিনের একটি রহস্যময় পাওনার কথাই বলি না কেন।

আমার মায়ের হাঁপানির রোগ ছিল। বর্ষাকাল থেকে আরম্ভ করে শীতকালে তা অত্যন্ত বাড়তো। এক বছর এমন হলো যে কলকাতার ধুলো-ধোঁওয়ার বাইরে ফাঁকা জায়গায় রোগিনীকে নিয়ে কিছুকাল রাখার নির্দেশ দিলেন কলকাতার এক বড় বিলেতফেরৎ ডাক্তার। স্থির হলো পুরীর সমুদ্রতট সবচেয়ে ভালো এবং রোগ-উপশমের স্থান।

গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য পরিবারের পরম সুহৃদ আমাদের প্রতিবেশী আশুতোষ দাশ পুরীতে তখন পুলিশ ইন্সপেকটারের কাজে নিযুক্ত। পিতৃদেব তাঁর অগ্রজ প্রতিম আশু দারোগার কথা স্মরণ করলেন। একটানা দীর্ঘ ছ'সাত মাস কাল পুরীতে থাকা হবে—এই রকম পরিকল্পনায় পুরীর সমুদ্রসন্নিকটস্থ কোনো নিরাপদ স্থানে বাড়ি-ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করবার জন্যে পিতৃদেব সবিস্তারে আশু দারোগাকে চিঠি লিখলেন।

থানার পুলিস কোয়ার্টার তখন ছিল কিনা জানি নে। আশু দারোগা থাকতেন একক,—ফ্ল্যাগ স্টেশনের কাছাকাছি পুরীর সমুদ্র-তটে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেলের একটি কক্ষে।

আশু দারোগা পত্রপাঠ সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে চিঠি দিলেন—থাকার জন্যে ফ্ল্যাগ স্টেশনের কাছাকাছি 'সুধাসিন্ধু' ছোট বাড়ির একটি আলাদা অংশ ভাড়া নেওয়া হয়েছে। নির্ঝঞ্ঝাট পল্লী, সমুদ্র অতি কাছে এবং একেবারে নিরাপদ স্থান। 'সুধাসিন্ধু' বড় বাড়িটি দোতলা,—ছোট বাড়িটি তিন অংশে বিভক্ত। সামনেও দুটি ভাগ। একটিতে স্বয়ং গৃহস্বামিনী—প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা এবং নেতাজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মাতৃদেবী তাঁর একটি নাতিকে নিয়ে থাকেন। নির্মলবাবু পুরীতে মাঝে মাঝে আসেন, অবিবাহিত আদর্শবাদী যুবক। আরেক অংশ আমরা ভাড়া পেলাম আশু দারোগার আনুকূল্যে। পিছনের দিকে পুরীর পুলিশ থানার সাব ইন্সপেক্টার সনৎবাবু সপরিবারে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকেন।

পিতৃদেব যেন হাতের কাছে স্বর্গ পেলেন। দীর্ঘকাল তিনি পুরীতে কলকাতায় বড়বাজারের ব্যবসাপত্তর ছেড়ে থাকতে পারবেন না। আশু দারোগা রইলেন অভিভাবক স্বরূপ বাড়ির কাছাকাছি। গৃহস্বামিনী অত্যন্ত সম্ভ্রান্তা আর পিছনে সনৎ দারোগার পরিবারবর্গ। এমন সোনায়-সোহাগা সৌভাগ্যের লক্ষণ বৈকি!

ঝাউয়ের মর্মর শব্দের সঙ্গে সমুদ্রগর্জনের প্রবল ধ্বনি আর নীল নীল নীলাচলের অন্তহীন সমুদ্র,—সাপের ফণা তুলে বালুতটে এসে আছড়াপিছড়ি খাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য গরুর গাড়িতে উপবেশন করে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেলাম।

আশু দারোগা উপস্থিত ছিলেন, সনৎবাবুও এলেন এবং অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মাতৃদেবী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। 'সুধাসিন্ধুর' ছোট বাড়ির সামনের সুধাসিন্ধু ভবনের সামনের দিকের এক অংশে আমরা প্রবেশাধিকার লাভ করলাম। বাবা, মা, আমার

বিবাহিতা বড় বোন বড়দি, গ্রাম্য বিধবা প্রতিবেশিনী সরলা পিসি, আমি, আমার ছোড়দা এবং আমার পরের বোন নিতান্তই বালিকা বিমলা ওরফে খুকি আর মায়ের সদ্যজাত কনিষ্ঠ কন্যা অমলা—এই কয়েকজনের পরিবার—দুটি গরুর গাড়ি ভর্তি লোকজন এবং মালপত্তরে ঠাসা। হাজির হলাম পুরীতে—সমুদ্রের কাছাকাছি বাড়ি 'সুধাসিন্ধু' ভবনে। বড়দা থাকেন গোবরডাঙ্গায় ডাক্তার জ্যেঠামশায়ের তত্ত্বাবধানে, মেজদা বর্ধমানে পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত আর বর্ধমান জেলার বরাকরে মেজদি শ্বশুরালয়ে—এ যাত্রায় তাঁরা কেউই আসতে পারেন নি।

ভাই-বোনেদের মধ্যে বড়দি তখন সাবালিকা, সুদর্শনা—রুগ্ন মায়ের পরিচর্যা করবার জন্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে ছাড়পত্র পেয়ে এসেছেন। গ্রাম্য প্রতিবেশিনী বিধবা সরলা পিসি তখন আমাদের সংসার থাকেন। পিতৃদেব কয়েকদিন থেকে কলকাতা ফিরে যাবেন, মাঝে মাঝে যাতায়াত করবেন। শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলার বাড়িতে তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটবে না,—কেননা, সেখানেও তিনি আত্মীয়পরিবৃত।

অদূরে সমুদ্রের ডাক শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি রমণী-কণ্ঠের মধুর কলধ্বনি আমার কানে এসে পৌঁছলো। পাশে 'সুধাসিন্ধু' বড় বাড়ি। সাদা দ্বিতল বাড়িটির সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে-বসা একটি সুন্দরী যুবতীর কণ্ঠস্বর। আমার বড়দিকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনারা এলেন ?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন থাকবো এখানে।' বড়দি সরবে উত্তর দিলেন।

'আমরাও—পাশাপাশি আপনাদেরই প্রতিবেশী।'

'বেশ তো। খুবই আনন্দের কথা। যাতায়াত করা যাবে। ভালো করে আলাপ পরিচয় হবে।'

বড়দির কথার প্রত্যুত্তরে সুন্দরী যুবতী রমণী বিমর্ষ হাসি হেসে

বললেন, 'যাতায়াত নয়, অনুগ্রহ করে যদি আপনি আসেন। আমার চলা ফেরা বারণ।'

'সুধাসিন্ধুর' বড়বাড়ির যুবতী কন্যার বিবর্ণ এবং বিমর্ষ ওষ্ঠে মৃদু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। অল্পবয়স্ক আমি সে হাসির মধ্যে এক সকরুণ মর্মরধ্বনি শুনলাম আর সেই সময়ই আমাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় ঘটে গেল। সেই প্রথম দর্শনের ভাব-বিনিময়কে জীবনে আজো কাটিয়ে উঠতে পারি নি—যেমন পারি নি পুরীর সমুদ্র-দর্শনকে।

পুরীর সমুদ্র দেখা জীবনে অনেকবারই ঘটেছে এবং বেঁচে থাকলে আরো ঘটবার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু সেদিনের সেই তরুণী ওষ্ঠের হাসির ঝিলিক, সেই হাসিভরা আহ্বানের ধ্বনি পরপর বহুবার পুরীতে গিয়েও আর শুনতে পাইনি—পাবো নাও আর কখনো।

'সুধাসিন্ধু' ছোটবাড়ির একাংশের অধিবাসিনী আমার বড়দি কমলা দেবীর সঙ্গে 'সুধাসিন্ধু' বড়বাড়ির অধিবাসিনী যুবতী অমলা দেবীর কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্যেই একটি অন্তরনিষ্ঠ সখিত্বের ভাব-বিনিময় ঘটে গেল। আর কচি কিশোর আমি কেমন করে না জানি আপন সহোদরা বড়দির মতনই অমলাদিরও অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের অধিকারী হলাম।

অমন সুন্দরী যুবতী অমলা দেবীর এমন কী কঠিন অসুখ, যার জন্যে তাঁর চলাফেরা বারণ!

অমলাদিরা ব্রাহ্ম পরিবারভুক্ত! তাঁর পিতৃদেব কোনো এক নেটিভ স্টেটের ম্যানেজার। খুবই অবস্থাপন্ন সংসার তাঁদের। অমলাদিরও বিবাহ হয়েছে সমতুল বনিয়াদী বংশে। পাত্র উচ্চবিত্ত রাজপুরুষ। কিন্তু দীর্ঘ ছ'মাসের অধিষ্ঠান কালে অমলাদির স্বামীর সাক্ষাৎ আমরা লাভ করি নি। তিনি নাকি চাকরির ক্ষেত্রে আরো উন্নতি লাভের আশায় বিলেতে গেছেন। আর ডাক্তারেরও নিষেধ

স্বামী-স্ত্রীর মিলন এখন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

অমলাদির কাশির অসুখ, হার্টের অবস্থা খারাপ। ডাক্তার প্রকাশ না করলেও আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়াপড়শীর ধারণা তাঁর যক্ষ্মা রোগ। তখনকার দিনে এ-রোগ সারতো না। ইহসংসারে পরমায়ু তাঁর দিন দিন কমে আসছে।

'তুমি ভাই কমলা আর আমি অমলা। আমরা শুধু দুই বন্ধু নই, দুই বোন।'

অমলাদির কথার সমর্থনে বড়দি বলতেন, 'তাতে আর সন্দেহ কী। গতজন্মে আমরা বোধহয় তাই ছিল্যাম।'

বড়দি উঠে আসার সময় অমলাদি নিবিড় হাতে বড়দির হাত জড়িয়ে ধরে মিনতি জানাতেন, 'আবার এসো ভাই ওবেলা। এবেলা ওবেলা দুবেলা অন্তত আমার কাছে আসা চাই-ই কিন্তু।'

বড়দি আশ্বাস দিয়ে বলতেন, 'নিশ্চয়ই আসবো।'

এবেলা ওবেলা দুবেলা প্রতিদিন অমলাদিদের 'সুধাসিন্ধু' বড় বাড়িতে যাওয়া না ঘটলেও বড়দি প্রায়ই যেতেন।

আর আমি যেতাম মাঝে মাঝে গানের আকর্ষণে। গান-গাওয়া বারণ ছিল অমলাদির। তবু অর্গানের রীড টিপে মৃদু মধুর বিষাদ কণ্ঠে অমলাদি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন, 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'—কিংবা 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।'

একদিন বড়দির সঙ্গে গিয়ে অত্যন্ত প্রলুব্ধ হয়ে দুর্জয় সাহসে সদ্য শেখা একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছিলাম, 'আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন।'

অমলাদি অর্গান ফলো করছিলেন—গানের মাঝপথে সুরের এবং কথার আবেগে হঠাৎ তিনি বাজনা বন্ধ করে দু'চোখ ভরে কাঁদতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই গাওয়া গানের আমার ভুল সুরাংশগুলি সংশোধন করে দিলেন। তারপর আমি প্রায়ই যেতাম আর ফেরার সময় অমলাদি আমাকে

একটি করে আপেল দিতেন খেতে।

বাড়িতে এ নিয়ে খুবই আপত্তি চলতো। অমলাদির সংক্রামক ব্যাধি, তাঁর হাতের ছোঁওয়া আপেল খাওয়া উচিত নয়। গরম জলে সিদ্ধ করে সে আপেল দু'চারবার খেয়েছি। তারপর লুকিয়ে চুরিয়ে তাজা অসিদ্ধ আপেলই খেয়েছি বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে-শুনিয়ে। অমলাদির স্নেহের দানকে রোগ ভয়ে কোনদিনই ফেলে দিয়ে তার অমর্যাদা করি নি।

তিনমাস পুরীতে থেকে বড়দি শ্বশুরবাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন, ছ'মাস পর মা সুস্থ হলে আমরাও কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম। অমলাদিরা তখনো 'সুধাসিন্ধু'র বড় বাড়িতে ছিলেন।

রহস্য দুর্জ্ঞেয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও তাকে সব সময় বোঝা যায় না! অন্তত আমি তা বুঝতে পারি নি।

সেবার পুরী গিয়েছিলাম নবপরিণীতা বধূকে নিয়ে। 'সমুদ্র-সৈকতে' ক'দিনের সমুদ্র-দর্শন নব বিবাহিত জীবনকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভরিয়ে রাখবে—এই রকম এক রোমান্টিক ভাব কল্পনায়।

পুরীতে সমুদ্রের একেবারে ধারেই স্বর্গদ্বারের এক আবাসিক রম্য ঘরে এবারের অধিষ্ঠান। এর আগেও আর একবার পুরী গিয়েছিলাম প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে পূর্ণ কিশোর দুই বন্ধুতে মিলে। আমার সহপাঠী ভূপেন্দ্রনাথ শীল এবং আমি। ভূপেন ধনাঢ্য পরি-বার জাত, দু'জনেই উঠেছিলাম পুরী আর্য নিবাস হোটেলে। অর্থাভাব ঘটেনি ধনীপুত্র বন্ধুর আনুকূল্যে। ছুটে গিয়েছিলাম সর্বপ্রথমেই 'সুধাসিন্ধু'তে। কিন্তু যা শুনেছিলাম তাতে আর চোখের জল চেপে রাখতে পারি নি। অমলাদির মৃত্যুর খবরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম।

অমলাদি আর নেই—কিন্তু পিছুনের ডাক, সেই পিছুনের ডাক আবার শুনতে পাই কেন? বার বার সে ডাক ঝাউয়ের মর্মরে মর্মরে।

সমুদ্র গর্জন তাকে চেপে রাখতে পারে না।

শ্রীমতী হাসি দেবী আমার নবপরিণীতা স্ত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই, এ পাশ করে বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হয়েছেন।

অক্টোবরে পুজোর ছুটি। আমিও অফিস থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়েছি। পুরী পৌঁছে ঘরে মালপত্তর এবং স্ত্রীকে রেখেই কী যেন এক দুর্বার আকর্ষণে স্বর্গদ্বার থেকে ফ্ল্যাগ স্টেশন দুপুরের রোদে ছুটে চলেছিলাম।

এসে দাঁড়ালাম সেই 'সুধাসিন্ধু'র বড় বাড়ির সামনে। ছোট বাড়ির দিকে আর লক্ষ্য নেই। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মা তখন ছিলেন না। পাশে নেতাজীর পিতৃভবন—মায়ের সঙ্গে প্রথম পুরী যাওয়ার সময় তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল সেই ভবন—এখন সে বাড়ি জাঁক জমকের। 'সুধাসিন্ধু' ছোট বাড়িতে এখন সবাই অপরিচিত জন।

কিন্তু 'সুধাসিন্ধু' বড় বাড়ির এ কী দশা! ভগ্ন গৃহ, ভগ্ন চত্বর। সংস্কারাভাবে পতিত। দোতলার সিঁড়িটির দর্শন লাভ করলাম। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে যে ঘর তা ভগ্নপ্রায়। বাদুড় চামচিকের বাস—সোঁতা সোঁতা বিশ্রী দুর্গন্ধ।

গা-ছম-ছম করে উঠলো। উঠেই আবার নেমে এলাম। পা দুটো কাঁপছে কেন? চোখদুটি অশ্রু বাষ্পরুদ্ধ হয়ে উঠছে কেন? এ কী! এ কোন কণ্ঠের গান শুনছি—'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে!'

ঘরে ফিরতেই নব পরিণীতা স্ত্রী অভিযোগ প্রকাশ করলেন, 'আমাকে একা ফেলে কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছিলে?'

আকর্ষণের কথা অকপটে মন খুলে স্ত্রীকে বলতে পারলাম না—আমতা আমতা করে কোন রকমে রহস্য গোপন করেছিলাম।

আমার মুখ থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে হাসি দেবী সাশ্চর্যে আমার ডান হাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কী? হঠাৎ একটা

আপেল হাতে করে এনেছো? তা একটা আপেল কেন।'

সত্যিই তো! সবিস্ময়ে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি —একটি সবুজ সুডৌল আপেল সযত্নে ধরে আছি।

এ রহস্যেরই বা কী সদুত্তর হাসি দেবীকে দিতে পারি?

॥ সাত ॥

পিতৃদেবের জীবিতকাল পর্যন্ত দেশের গ্রামের সঙ্গে আমার সুনিবিড় যোগাযোগ ছিল। বাল্যকাল থেকে যদিও শহর কলকাতায় বসবাস, কিন্তু চব্বিশ-পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামে ভট্টাচার্য পল্লীটি ছিল হৃদয়ের অতি কাছাকাছি। ডাক্তারবাবুর বৈঠক একটি প্রসারিত প্রাণের মেলা। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় এবং রাত্রে যে আসর তা শুধুই বয়স্কদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না—আমাদেরও অবাধগতি ছিল সেখানে,—সে কথা পূর্বেই বলেছি।

স্কুলের জীবনে প্রতি ছুটিতেই দেশে যেতাম। আমার প্রিয় জন্মভূমি। সেখানে কিশোরমেলায় আমার স্থান শহরবাসী বলে আলাদা কিছু ছিল না।

আমার জ্যেষ্ঠতাত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিঃসন্তান ছিলেন —আমাদেরই তিনি পুত্রবৎ লালনপালন করেছেন। পিতৃদেব জীবিকা-উপার্জনে কলকাতাবাসী। দীর্ঘদিন ভাড়াটিয়া বাড়িতে থেকে দক্ষিণ কলকাতা বালিগঞ্জ প্লেসে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করলেন। কিন্তু বেশিদিন ভোগ করা তাঁর অদৃষ্টে সইল না। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমাদের পরমারাধ্যা বড়মা পরলোকগমন করলেন এবং তারই কয়েকমাস পরেই আবার দুর্ভাগ্য-বশত আমরা মাতৃহারা হলাম। পরপর শোকের আঘাত—প্রিয়জনের মৃত্যু। স্বপ্নের কৈশোর স্বপ্নেই থেকে গেল। যৌবন বড় বেশি বাস্তবমুখী—শোক তাপ জীবন-সংগ্রামে ভরা।

ডাক্তারবাবুকে তখন আর গ্রামে ফেলে রাখা অকর্তব্যবোধে

আমাদের শহরের বাড়ি বালিগঞ্জ প্লেসে আনার প্রচেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু ডাক্তারবাবু বাড়ির মায়া সহজে পরিত্যাগ করতে রাজি হননি। তাই দেশের বাড়িতে আমাদের প্রায়ই যাতায়াত করতে হত। কিন্তু শেষে যেদিন প্রকৃতই ডাক্তারবাবুকে আমাদের কাছে চলে আসতে হল সেদিন বনগাঁ প্যাসেঞ্জার যখন যমুনা ব্রীজ পার হচ্ছে তখন শীর্ণ উপনদী যমুনার আর্তি আমার কানে যে কি আবেদন জানালো যা এই পরিণত বয়সেও ভুলতে পারিনে।

আমাদের ভট্টাচার্য পাড়ার অনতিদূরে গ্রাম্য নদী। সেই নদীর ছোট ব্রীজের ওপর দিয়ে গমগম শব্দে ট্রেন পার হয়ে যায়। সে শব্দ আজো আমার কানে ভাসে। ছুটির অবকাশে দেশে গেলে আমরা এই যমুনানদীর ব্রীজে গিয়ে বসতাম। গোধূলির রাঙা আলোর শেষ রশ্মি যমুনার নীল জলে প্রতিভাসিত হত। নিচে নৌকো চলেছে—ছোট ছোট নৌকো। সেই নৌকোয় ভিন্ন গ্রামের আরোহী-আরোহিনীর দল। কখনো নব বরবধূর বিহার। তারই সঙ্গে দেখতাম—অদূরে কালী কুণ্ডুর শ্মশান। চিতার আগুনে জীবন অবসানের দাউ দাউ শিখা,—একতারা হাতে বৈরাগী গান গায়ঃ

'অন্ধ হবে শেষ কালে।
তুমি মলে চিতায় ফেলে, দেবে তোমার মুখ জ্বেলে।
তোমায় দগ্ধ করে আসবে ফিরে, মুখে হরিবোল বলে।।'

যমুনা ব্রীজের একধারে আমাদের তরুণ কিশোরদের আসর বসতো। জমিদার মেজতরফের খেলার মাঠ থেকে সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই আমরা কয়েকজন এখানে চলে আসতাম। শচীন ঘোষ ভালো ছবি আঁকতো, সাহিত্যবোধও প্রকৃতই তার চমৎকার। আমাদের দু'জনের মধ্যে গভীর প্রণয়। নিতাই ঘটক আজো গান গায়, খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী। 'পদ্মা'র কবি ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গ্রামের স্কুলের বাংলার টীচার। আমরা তাঁর ছাত্র শ্রেণীর

হলেও অন্তর-সান্নিধ্যের বন্ধুজন। কবি ক্ষেত্রমোহন আমাদের মতন অতি তরুণসাহিত্য-প্রেমিকদের সঙ্গে অত্যন্ত আপনজনের মতনই মিশতেন। তাঁর বাড়িতে আমাদের সাহিত্যের মজলিশ বসতো প্রায়ই। আরো কয়েকজন আমার প্রিয় সঙ্গী—শৈলেশ মুখোপাধ্যায় বাবুপাড়া থেকে ছুটে আসতো আমাদের আড্ডায়, ভালো ফুটবল প্লেয়ার হেমচন্দ্র এবং দেওয়ানজী বাড়ির ভানু চাটুজ্জে, আমাদের পাড়ার সন্তোষ ভট্টাচার্য ওরফে সোনা—অনেকেরই নাম মনে পড়ে, যদিও জীবনের ক্ষেত্রে আজ পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। গ্রামের এই শাখানদী যমুনাই আমাদের বেঁধে রেখেছিল সখ্যতা এবং সংস্কৃতির বন্ধনে।

কিন্তু হঠাৎ এখন এ-প্রসঙ্গ এসে পড়ল কেন? গোবরডাঙ্গার কিশোর তরুণ এই দল একখানি হাতের লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছিল 'আলো' নাম দিয়ে। আর কলকাতায় আমরা কয়েকজন নবীন সাহিত্যপ্রেমিক বের করেছিলাম 'খেয়ালিয়া'। 'আলো' নিভে গেছে,—'খেয়ালিয়া' দেয়ালিয়া হয়ে স্মরণের অন্তরালে গা ঢাকা দিয়েছে। তবে আলো আর খেয়ালিয়া আমার সাহিত্যপ্রেমকে জাগিয়ে তুলেছিল।

ডাক্তারবাবুকে নিয়ে কলকাতায় ফেরার পর শচীন একদিন এক পত্রযোগে অভিযোগ প্রকাশ করলে, 'এত কাগজে গল্প কবিতা লিখছো, বেতারের কবি সম্মেলনে কবিকণ্ঠ শোনাচ্ছ, কিন্তু তোমার জন্মভূমি সম্পর্কে কোন কথা শুনি নে কেন?'

এ অভিযোগ আরো কয়েকজন করতেন। তদানীন্তন কালের বাংলা সাহিত্যে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে যিনি বিশেষভাবে নাম করে-ছিলেন তিনি আমাদের গোবরডাঙ্গা এবং খাঁটুরার গৌরবমণি স্বর্গতা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। আমরা যারা নতুন লিখিয়ের দল তখন প্রায়ই যেতাম প্রভাদির মাতৃ-আবাস খাঁটুরার বাড়িতে। আমাদের সান্ধ্য-মজলিস বসতো সেখানেও। প্রভাদি আজ আর জীবিত নেই

এবং জীবনের অপরাহ্ণকালে তিনি শিক্ষিকাবৃত্তি নিয়ে কলকাতাতেই বহুকাল বসবাস করে গেছেন। তাঁর কলকাতা আবাসেও মাঝে মাঝে উপস্থিত হতাম। আমাদের আসরে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর অনুজা প্রখ্যাত লেখিকা, কবি এবং চিত্রশিল্পী হাসিরাশি দেবীও প্রায়ই থাকতেন।

আলোর আসর বসত গোবরডাঙ্গার জমিদার মেজতরফের প্রসন্ন ভবনে। নেতা ছিলেন উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। গ্রামের হাতের লেখা কাগজ আলো থেকে শচীনের নাম ছাপার অক্ষরে যখন দেখা গেল, তখন শচীনকে লেখক বলে স্বীকার করে নিলাম আমরা। শচীন তখন আমাদের দলের মধ্যে রীতিমত লিখিয়ে একজন। তখনকার দিনের শহুরে এক গল্প-মাসিক পত্রিকায় তার একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। আর সে গল্প গ্রামেরই কাহিনী—সে গল্প প্রকাশের জন্যে কিন্তু সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যাঁর তিনি গোবরডাঙ্গার বাবুপাড়ার অধিবাসী হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমার বড়দার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আমার সাহিত্য-প্রচেষ্টা দেখে আমাকে খুবই উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ঠিক যে কথা প্রভাদি বলতেন, 'তোমাদের লেখায় গ্রাম্যজীবন কই? গ্রামই তো জাতির আসল পরিচয়।' এমন কী এ প্রসঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উদাহরণও দিতেন প্রভাদি। হরিপ্রসন্নদার বক্তব্যও ছিল ঠিক সেই ধরনের, কখনও বা অতি উগ্র।

কবি ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বই-এর নাম 'পদ্মা'। 'পদ্মা' আমাদের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—তারপর 'বিসুবিয়স'। হরিপ্রসন্নদা চটে গেলেন ক্ষেত্রবাবুর ওপর—'পদ্মা কেন? আমাদের গ্রামের নদী যমুনাকে নিয়ে কী কবিতা লেখা চলে না?'

চলে—আর 'যমুনাকে' নিয়ে শুধু কবিতা নয়—সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রথম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমি। সে এক কৌতুককর কাহিনী।

শচীনের দেখাদেখি গল্প লিখলাম এবং তা ছাপার হরফে প্রথম প্রকাশিত হল তদানীন্তন কালের বিখ্যাত মাসিকপত্র 'অর্চনায়'। গ্রামের বন্ধুজনের কাছে সাহিত্যিক বলে আমিও স্বীকৃতিলাভ করলাম। 'অর্চনা'-সম্পাদক স্বর্গত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এবং কৃষ্ণদাস চন্দ্র নবীন লেখককে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠতাত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নিয়মিতভাবে 'অর্চনা'র লেখক ছিলেন। সেই সূত্রে 'অর্চনা'য় প্রবেশের দ্বার খোলা পেলাম।

গোবরডাঙ্গা 'কুশদ্বীপ' অন্তর্গত এক সাংস্কৃতিক মর্যাদাসম্পন্ন গ্রাম। এখান থেকে 'কুশদহ' পত্রিকা বের করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রাক্তন বিশিষ্ট সমাজসেবী দাস যোগীন্দ্রনাথ।

দাস যোগীন্দ্রকে দেখেছি কিশোর কালে আমার এক সহধ্যায়ী বন্ধু রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়দের কলকাতা আবাস দর্জিপাড়ার বাড়িতে।

রামকৃষ্ণের পিতৃদেব অ্যাডভোকেট নীলাচল মুখোপাধ্যায় গোবর-ডাঙ্গার কাছাকাছি বেড়গুম গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুখোপাধ্যায় পরিবারজাত। নীলাচলবাবু তখনকার দিনে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কন্যারা বেথুন স্কুল, কলেজে পড়ত। ছেলেবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখে নীলাচলবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন—লেখায় উৎসাহ দিতেন। তাঁরই দর্জিপাড়ার বাড়িতে দেখলাম তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং সাহিত্যসেবী দাস যোগীন্দ্রকে। পরণে খাটো কাপড় এবং গায়ে ফতুয়া জাতীয় জামা—গেরুয়া রঙে ছোপানো। একমুখ সাদা দাড়ি—দুটি চোখ উজ্জ্বল এবং সস্নেহ দৃষ্টিধারা। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'ধর্ম হচ্ছে তাই যা ধারণ করে আমরা চলি। বেশ তো, সাহিত্যকে ধারণ করেছ—সৎ-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হও। সাহিত্যই তোমার জীবনধর্ম হোক।'

অর্চনায় ধারাবাহিকভাবে 'কুশদ্বীপের একশো বছরের সাহিত্য-

সাধনার' কথা লিখছিলাম।

কতই বা আর বয়স তখন। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলেজী বয়সও অতিক্রম করি নি। কুশদ্বীপের কথায় যমুনা নদী প্রসঙ্গে একটি উক্তি করেছিলাম—যমুনাকে ঘিরে যে সব ঘাট আর গ্রামগঞ্জ তাদের অনেকের মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং লীলা স্পর্শের সন্ধান পাওয়া যায়—যেমন গোপিনীপোতা।

ব্যস! আর যাই কোথায়? প্রখ্যাত সমালোচক সজনীকান্ত দাস লিখলেন, প্রত্নতত্ত্বের নব আবিষ্কারক। কোন দিন হয়ত শোনা যাবে হুগলীর বাঁশবেড়িয়ার বাঁশ বনের বাঁশ থেকেই কৃষ্ণের বাঁশি তৈরী হয়েছিল। এবম্বিধ কিছু কথার টিপ্পনি।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। যাঁর সম্পর্কে আজকের স্মৃতি তা সর্বাঙ্গ সুখের কিনা জানি নে।

তবে এ স্মৃতি যে সুখ এবং দুঃখ মেশানো অশ্রুমাল্য তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একদিন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কবি সম্মেলন অনুষ্ঠানে শুনলাম আমার অগ্রজপ্রতিম আত্মীয় কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কবিকণ্ঠ উচ্চারিত 'যমুনা' সম্পর্কে একটি কবিতা। তারই অনুরণনে আমি যেন কবে একদিন লিখেছিলাম একটি কবিতা—'যমুনাবতী'।

কয়েকটি পঙক্তি তার এখনো মনে আছে—

'কী এক প্রতিমা মুখ নীলজলে প্রতিচ্ছায়া আঁকে
অনেক দূরের ডাক অনেক কাছের ভাষা সরে সরে আসে
এ হৃদয়ে কার ছোঁওয়া সেই চুপিস্বর
স্মৃতি ভর ভর
বড়ো সুখ, বড়ো সুখ—খুঁজে পাই কাকে?'

এই কবিতা শুনে হরিপ্রসন্নদা বড়ো খুশী হয়েছিলেন—তাঁর প্রিয় জন্মভূমি যমুনানদীর নীলজলে প্রতিমা মুখের ছায়ার প্রতিচ্ছবি দর্শনে। কবিতাটিতে লেখা আরো দু'লাইনও মনে পড়ছে যেন—

'তাই নিয়ে ছড়াগান চোখে ঘুম কে যায় শুনিয়ে—
আজ যমুনার অধিবাস কাল যমুনার বিয়ে।'

চোখের সামনে আজ আবার দেখছি আমার সেই কৈশোর স্বপ্নের যমুনাবতীকে। যমুনাবতী আমারই দেওয়া নাম।

কিশোর কালে দুর্গাপূজার সময় দেশে যেতাম প্রতি বছরই। আমার ছোট কাকা গোবরডাঙ্গার জমিদারী সেরেস্তায় ছোট তরফের তহশীলদার ছিলেন। অতি সামান্য মাস মাইনে ছিল তাঁর। জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করলেও ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য পরিবারজাত ধার্মিক লোক কাকা প্রজাপীড়ন করে দু'পয়সা কামাতে পারেননি কোন কালেই। বরঞ্চ তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতপুত্র বড় দাদামণি ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথের সহৃদয়তার আশ্রয়েই ভট্টাচার্য যৌথ পরিবারে থেকে সংসার প্রতিপালন করতেন। কিছু জমিজমা, দেবোত্তর সম্পত্তি এবং যজমান শিষ্যের ঘরে পূজা-আর্চায় বাড়তি আয় ছিল তাঁর।

ছোট কাকার পূর্বে আমার মেজ জ্যেঠামশায় উপেন্দ্রনাথ এই কাজ করতেন। সুরেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। উপেন্দ্রনাথের কয়েকটি কন্যা, কিন্তু পুত্র সন্তান ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ আমার বড়দাকে সন্তানতুল্য মানুষ করেছিলেন আর আমার বাল্যকালে পিতৃস্বরূপ ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। মাতৃস্বরূপা উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী ননীবালা দেবী। —অর্থাৎ আমাদের মেজমা।

বাল্যকালে আমি তাঁদের স্নেহক্রোড়েই প্রতিপালিত হয়েছি। তখনকার দিনের মহিলা হলেও আমার মেজমা কিছু ইংরেজি বাংলা লেখাপড়া শিখেছিলেন। বাল্যকালে তাঁর কাছেই আক্ষরিক শিক্ষা আমার। উপেন্দ্রনাথ মুখে মুখে শিবস্তোত্র, ভগবতী বন্দনা, দুর্গাস্তব শিখিয়েছিলেন আমাকে। তাঁর আকস্মিক পরলোকগমনে গোবরডাঙ্গার ভট্টাচার্য পরিবারে যে স্থান শূন্য হল পরবর্তীকালে তা আর কোন দিন পূর্ণ হয়নি। কিছুটা তাঁর পেশা এবং ধার্মিক সত্তাকে গ্রহণ করেছিলেন ছোটকাকা।

ছোট কাকা দুর্গাপূজা, কালীপূজা করতেন, আর কিশোর কালে আমি তাঁর সঙ্গে তন্ত্রধারগিরি করতাম। মনে আছে—দুর্গামণ্ডপে আমার চণ্ডীপাঠ। গানের কণ্ঠ ছিল একদা—তাই সুর করে 'চণ্ডীপাঠ' করতে পারতাম, সেই সুরে আকৃষ্ট হয়েছিল যমুনাবতী। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, স্নানের পর একরাশ কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ পীঠময় ছড়ানো, চোখ দুটি বিষণ্ণ, কিন্তু মুখখানিতে মা দুর্গার প্রতিমা মুখের আদল। বর্ধিষ্ণু ঘরের ব্রাহ্মণকন্যা। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। নাম তাঁর যাই হোক না কেন আমি বলতাম যমুনাদি —আর কবিতায় তিনিই যমুনাবতী।

যমুনাবতী আমার মেজ জ্যেঠামশায়ের কন্যা তরুলতার অর্থাৎ আমার ন'দির বান্ধবী ছিলেন। ন'দির বিয়ে হয়েছিল আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে। মেজ জ্যেঠামশায়ের আদরিণী কন্যা বিয়ের পরেও পিতৃগৃহেই থাকতেন। ন'দি আর যমুনাবতী একাত্ম! যমুনাবতীর বিয়ের সমসাময়িক কালে ন'দিরও বিয়ে হয় খুব ঘটা করে। যমুনাবতী এবং ন'দি বিয়ের পরও অনেকদিন একসঙ্গে বসবাস করেছেন ঘনিষ্ঠের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে।

ন'দি, যমুনাদির বিয়ের কথা আমার বেশ মনে আছে। তখনকার দিনে কী ঘটারই না বিয়ে। যমুনাদির বিয়ের কথা বলি। ঢোল, কাঁসি, ব্যাগপাইপ বাজিয়ে ঝালর দেওয়া বড় পালকীতে যমুনাদি তাঁর সুপুরুষ ধনীপুত্র বরের সঙ্গে গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ জমিদার প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির প্রসন্নময়ী তলায় প্রণাম করতে গিয়েছিলেন। আমরা পাড়ার ছোট ছোট ছেলের দল বাজনদারের সঙ্গে নাচতে নাচতে অনুগমন করেছিলাম! পাকা দেখা এবং অধিবাস থেকে আরম্ভ করে বিবাহের রাত্রি পর্যন্ত কী খাওয়ার ঘটা! প্রতিমামুখী সুগৌরী ছিপছিপে কিশোরী মেয়ে টলটলে চোখদুটি নিয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন, আমরা তাঁর বিরহে কেঁদে আকুল হয়েছিলাম। কিন্তু সে কান্নার খানিকটা পুলক ছিল—আসল কান্না তার পরে।

যমুনাদি ফিরে এলেন পিতৃভূমিতে আবার বছর পাঁচেক পরে চিরকালের জন্যে। বড়লোক বাপ-মা চোখের জলে আদরের দুহিতাকে স্থান দিলেন। শুধু যমুনাদি একা নন—সঙ্গে তাঁর গর্ভজাত এক পুত্র এবং একটি কন্যা। যমুনাদির সিঁথের সিঁদুর ঠিকই আছে—এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণই ছিল। দুটি সন্তানের জনক যমুনাদির স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন আর কেনই বা গেলেন, সে রহস্যের কথা ঠিক ঠিক ভাবে কোনদিনই জানতে পারি নি। যমুনাদির বাবা-মা দুঃখ করে যে কথা বলতেন তা নাকি তাঁদের জামাই-এর নিজ স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি অহেতুক এক সন্দেহপ্রবণতা। তাই তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিত্যাগ করে বিরাগী হয়ে চলে যান।

আমার চোখের জল এক হয়ে মিলে যেত দুর্গামণ্ডপে যখন আমি চণ্ডীপাঠ করতাম আর সেই সুরের অনুকরণে দেখতাম যমুনাদির ডাগর কালো দুটি চোখ থেকে অনর্গল অশ্রুধারা বিগলিত হয়ে তাঁর প্রতিমা মুখখানিকে ভাসিয়ে তুলছে।

যমুনাদির পিতৃদেব সস্নেহে স্বামী পরিত্যক্তা কন্যাকে ঘরে তুলে নিলেন। দুটি নাতি-নাতনীকে মানুষের মতনই মানুষ করে তুলতে লাগলেন শিক্ষা-দীক্ষায়, আচার-আচরণে। স্বামী এবং নিজস্ব সংসার-সুখ থেকে বঞ্চিতা হলেও যমুনাদির কিন্তু কোন অভাবই তিনি রাখেন নি। তখনকার দিনের দামী দামী অলঙ্কার, শাড়ি, খাওয়া-দাওয়া—না, কোন অভাবই যমুনাদির নেই। এমন কি পিতৃ-সংসারের যাবতীয় কর্তৃত্ব যমুনাদিরই। মাসকাবারী হিসেবপত্তর, সংসার খরচের সব টাকা —কার জন্যে কি করতে হবে, কি আনতে হবে, লোকলৌকিকতা সব কিছুর ভার যমুনাদির ওপরই ন্যস্ত ছিল। আপাতদৃষ্টিতে যমুনাদির অপর কোন দুঃখ থাকার কথা নয়।

এমন কী যমুনাদির পিতৃদেব মৃত্যুর পূর্বে যমুনাদির আজীবন খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতন সঙ্গতি—জমিজমা, কোম্পানীর কাগজ, পৃথক

বাড়ি, সব কিছুরই সুব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাই কী সব ? একটি কিশোরী থেকে তরুণী, নারীহৃদয়ের চাহিদায় আর কী বাকি এবং ফাঁক ছিল যে কারণে যমুনাদিকে সহসা কলকাতায় বাবুরামঘাটের গঙ্গার অতল সায়রে এক নিশিডাকের আহ্বানে ছুটে যেতে হয়েছিল।

জাপানি বোমার ভয়ে আমি তখন গোবরডাঙ্গাতেই ছিলাম। খানিকটা বয়েস হয়েছে আমার। অন্তত নর-নারী এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে মনে আর কোন কুহেলিকা নেই। আর গ্রামে তখন কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছি লেখক-পরিচিতি লাভ করে। শহরের দু'চারটে খ্যাত-অখ্যাত পত্র-পত্রিকায় তখন নিয়মিত ভাবে আমার লেখা প্রকাশিত হচ্ছে ; আমার লেখা একখানি গল্পের বইও বেরিয়েছে—একখানি উপন্যাসও।

অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে আমার সাহিত্যিক পরিচয় এবং স্বাক্ষর দেদীপ্যমান।

কলকাতা থেকে ছত্রিশ মাইলের ব্যবধানে গোবরডাঙ্গা গ্রাম। জীবনের নানা ঘাটে তখন জীবনতরী বেঁধেছি। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে পাকা চাকরি।

গোবরডাঙ্গা থেকে শিয়ালদা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি।

আমার গল্পের বই পড়ে হরিপ্রসন্নদা বিক্ষুব্ধ। কেন,—কেন আমি গ্রন্থকারের ঠিকানায় গোবরডাঙ্গার নাম উল্লেখ করিনি। আর সে আফশোষ বুঝি হরিপ্রসন্নদার জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত ছিল। কলকাতা করপোরেশনের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে বৃদ্ধ বয়সেও আর একটি চাকরি তিনি কলকাতায় করতেন এবং প্রায়ই আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে আসতেন। বলতেন সেই এক কথাই, 'এত যে লেখ-টেক, কিন্তু গোবরডাঙ্গার কথা কই তোমার লেখায় ?'

এ লেখায় বারে বারে সেকথা মনে হওয়াতে স্মৃতি একটি কাহিনী-তেই আবদ্ধ থাকছে না। না থাকলেও স্মৃতি তো আলোছায়ারই নামান্তর।

যমুনাদির সঙ্গে হরিপ্রসন্নদা—দুটি পৃথক সত্তা, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই জীবনের অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকতায়। হরিপ্রসন্নদার পুত্রসন্তান নেই। দুটি কন্যা, দুজনেই সুপাত্রে বিবাহিতা। শেষ বয়সে তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন। কিন্তু জামাই মেয়েদের বারবার আহ্বানেও তিনি গ্রাম পরিত্যাগ করেন নি। এমনই ছিল গ্রামের প্রতি আকর্ষণ এবং ভালোবাসা।

কিছুকাল পূর্বে অসুস্থ হয়ে হরিপ্রসন্নদা এলেন কলকাতার এক হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে। শুনেছি,—তাঁর অন্তিমকালের শেষ কামনার কথা। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আত্মীয়স্বজনের কাছে শেষ আর্তি প্রকাশ করে যান—গোবরডাঙ্গার কালীকুণ্ডুর শ্মশানঘাটেই যেন তাঁর চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

কিন্তু যমুনাদি? ঠিক তার বিপরীত। যে গ্রাম তাঁকে আজন্ম লালন-পালন করেছে সে গ্রামে থাকতে তাঁর অনাকাঙ্ক্ষা, তাঁর লজ্জা। আর আমাকে সেকথা বারবার বলতেন, 'তুই, সেই কামনা কর, আমার যেন সেখানেই মরণ হয়! তুই কী বুঝিস নে, মেয়ে মানুষের শ্বশুরবাড়িই স্বর্গ।'

কিন্তু সে স্বর্গ তো অভিশপ্তের স্থান, অপমানের স্থান। যে সংসার তাঁকে দুশ্চরিত্রা অপবাদে দূষিত করেছে,—সেখানকার প্রতি তাঁর এত মমতা কেন?

যমুনাদির শ্বশুরবাড়ি খাস কলকাতায়। মহাযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার আতঙ্কে শহরবাসী যখন সভয়ে ছুটে চলেছে গ্রামের নির্বিঘ্ন আশ্রয়ে, এমন দিনেই যমুনাদি কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন রাতের ট্রেনে কলকাতায়।

কে এক সন্ন্যাসী নাকি এসে ক'দিনের জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন শহর কলকাতার বাবু ঘাটে। অলৌকিক শক্তিধর সন্ন্যাসী। যাকে যা বলেন তা নাকি নিশ্চিত প্রত্যয়—তা নাকি নিখুঁত ভাগ্যগণনা।

এ-খবর কার মুখ থেকে যমুনাদি শুনেছিলেন জানিনে। কিন্তু

জাপানি বোমায় বিধ্বস্ত কলকাতা—যেখান থেকে লোক পালিয়ে আসছে, সেখানে যমুনাদিকে যেতে দিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমন কী পুত্র-কন্যারাও নারাজ।

যমুনাদি তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন সন্ধ্যের পর রাতের অন্ধকারে বনগাঁ প্যাসেঞ্জারে উঠে বসলেন, এলেন বাবুঘাটে।

তারপর কেন যে তিনি গঙ্গার সলিলে আত্মবিসর্জন দিলেন, সে রহস্যের কথা কারুরই জানা নেই।

ডুবুরী লাগিয়ে বাবুঘাটের গঙ্গা থেকে তাঁর লাশ তোলানো হয়েছিল। তারপর যথারীতি পোস্টমরটমের পালা।

কোন সন্ন্যাসীই কিন্তু উপস্থিত ছিল না আউটরাম ঘাটের গঙ্গা-তীরে। অথচ যমুনাদি নাকি কার কাছ থেকে শুনেছিলেন সন্ন্যাসীর মুখ অনেকটা চেনাচেনা, কপালের এক কোণে তাঁর সেই দাগটি এখনো দেখা যায় যে দাগটি যমুনাদির স্বামীর কপালে ছিল। সন্ন্যাসীর দেখা পাননি তিনি, তবু কেন গঙ্গায় ডুবলেন যমুনাদি?

অনেক কাণ্ড কারখানা করে তাঁর শবদেহ পিতৃভবনে আনানোর ব্যবস্থা করা হল। সেদিন আর অফিস যেতে পারলাম না।

সে কী বীভৎস দৃশ্য! সারাদেহ পচে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে—অস্ত্রোপচারের ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন সর্বশরীরে।

কালীকুণ্ডুর ঘাটে শ্মশানচিতায় তোলবার সময় শেষবারের মতন যমুনাদির মৃত মুখখানি দেখলাম—

'কী এক প্রতিমা মুখ নীল জলে প্রতিচ্ছায়া আঁকে'—কিন্তু বড়ো সুখ, বড়ো সুখে নয়—'বড়ো দুঃখ, বড়ো দুঃখে খুঁজে পাই কাকে!'

॥ আট ॥

কোনো কোনো নাম অত্যন্ত পরিচিত হলেও হঠাৎ হঠাৎ স্মরণে আসে না। আর তখন যে মনের অবস্থা কী রকম হয় ভুক্তভোগীরা সহজেই তা অনুমান করতে পারেন।

যেমন এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের বারাণসী তীর্থের পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী বিস্তারিণী জাহ্নবীতটে দাঁড়িয়ে এই গোধূলি লগ্নে আলো-ছায়ার রহস্যময়তায় মীরার ভজন সঙ্গীত শুনতে শুনতে কিছুতেই কেন সেই প্রিয় নামটি আমি মনে করতে পারছি নে—যাঁর কথা এক্ষুনি আমার মনের ঢেউ-এর তরঙ্গে তরঙ্গে দোলায়িত হয়ে উঠছে।

কাশী আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি—বেশ কিছুদিন থেকেছিও। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছাকাছি আমার বড় পিসিমা থাকতেন তাঁর বিধবা কন্যা রাণীদির আবাসে। সে বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সোপান—সেই সোপানের পাদদেশে খর প্রবাহিনী জাহ্নবীধারা মনকে বড় উদাস করে তোলে। হরিশ্চন্দ্র ঘাট সংলগ্ন মহাশ্মশান। ঘন অমাবস্যায় ঘন বর্ষণমুখর রাত্রে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল বাল্যকালে দেখা 'হরিশ্চন্দ্র যাত্রাভিনয়।'

মীরার ভজনের কথা এখন না হয় মুলতুবি থাক। মুলতুবি থাকুক সেই তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা বৃদ্ধ মহিলার কথা যিনি শরতের গোধূলি আলোয় একটি সিঙ্গেল রীড হারমোনিয়াম বাজিয়ে খুশির সুরে ভজনের তান বিস্তার করছেন ভক্তি গদ গদ ভাবে আর তাঁর সুকণ্ঠে মীরার ভজন গীতির সূক্ষ্ম কাজগুলি শুনে বাহবা দিচ্ছেন কোন কোন সঙ্গীতানুরাগী শ্রোতা।

দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকোয় চলেছি হরিশ্চন্দ্র ঘাটে। একাই। সঙ্গের সঙ্গিনী গৃহিণী, কন্যা, গৃহিণীর প্রিয় অনুজা এবং তাঁর স্বামী ও তাঁদের কন্যা সবাই দশাশ্বমেধের ঘাটেই বসে রইলেন। বৃদ্ধার গান তাঁদের এত আকৃষ্ট করেছে যে তাঁরা গান ছেড়ে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যেতে এখন রাজি নন। সকাল-সন্ধ্যে দু'বেলাই তো চলছে গঙ্গাবক্ষে নৌকোভ্রমণ—হরিশ্চন্দ্র ঘাটে কী আর এমন আকর্ষণ আছে? আর তাছাড়া মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে সব সময়েই চিতা জ্বলছে। দেখলে কেমন যেন শ্মশান বৈরাগ্য জাগায়। তার থেকে ঢের ভালো সুকণ্ঠী এই বৃদ্ধার গান।

কিন্তু আমার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল—যে নামটি এত প্রিয় সেই নাম বিস্মরণের বেদনা আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। গান শুনতে গিয়ে কেবলই বিস্মৃত নামটি দোলা দিচ্ছিল। না, কিছুতেই সে নাম এখন আমার আর স্মরণে আসছে না। তার চেয়ে ঐ পরিবেশ পরিত্যাগ করাই ভালো।

পরিজন পরিবারবর্গের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে আমি উঠে-বসলাম গঙ্গাবক্ষের একটি নৌকোয়।

গৃহিণী কিন্তু পিছু ধাওয়া করেছেন—'কী দরকার আবার নৌকো চড়ার? অন্ধকার হয়ে আসছে। কেবল তো সকাল-সন্ধ্যোয় নৌকোয় ঘুরছো!'

বললাম—'তোমরা এখানে বসে গান শোন না কেন। আমি ঘুরে আসছি।'

'সেই হরিশ্চন্দ্র ঘাটে!'

'হ্যাঁ।'

'কী ব্যাপার বল তো?'

গৃহিণীর প্রশ্নে মৃদু হেসে বললাম, 'শ্মশান-বৈরাগ্য নয় তাই বলে।'

গৃহিণী বললেন, 'আমরা আর একটু পরেই বাড়ি ফিরব কিন্তু।'

'বেশ তো!'

'বেশ তো নয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্বনাথ মন্দিরে আজ শয়ান-আরতি দেখতে যাবো। পাণ্ডাঠাকুরকে বলা আছে।'

শ্রীমতীকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'সে তো রাত্রিবেলা। ততক্ষণে আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব।'

নৌকো চলেছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটের দিকে। কতটুকুই বা আর পথ। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছানো যায়।

হরিশ্চন্দ্র ঘাটের বাড়িতেই বড় পিসিমার মৃত্যু ঘটেছে। রাণীদি থাকেন দেবরের আশ্রয়ে। দেবরেরও মৃত্যু ঘটায় এখন তিনি লক্ষ্ণৌ,

কলকাতা আর বেহালায় আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বৃদ্ধা বাল্য বিধবা ঘুরে ফিরে থাকেন। তবে কাশীর বাড়ির অধিকার থেকে বঞ্চিতা নন। বছরের কয়েক মাস এখনো থাকেন কাশীতে। অমন জমজমাটে সংসারপুরী এখন খাঁ খাঁ করছে। পর পর কয়েকটি শোচনীয় মৃত্যু-ঘটনায় বাড়িটি এখন নিষ্প্রাণ। তাই এখন আর কাশীতে এলে এ-বাড়িতে উঠিনে।

রাণীদির দেবর প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখেছি কী স্বভাব-সুন্দর ব্যক্তিত্ব। হাসি-পরিহাসে মুখরিত অথচ ধর্মশীল ব্যক্তি। বিধবা-বৌ-ঠানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। আমার বৃদ্ধা পিসিমাকে তিনি মাথায় তুলে রেখেছিলেন। তাঁর বৌঠানের মা—সহায় সম্বলহীন নন। পিসিমার দেবর পুত্ররা কৃতী যশস্বী বিত্তবান এবং কর্তব্য-পরায়ণ। একমাত্র স্বর্গত পুত্রের একটি মাত্র পুত্র সন্তান ব্যানার্জী সাহেব ওরফে আমার পিসতুতো দাদার ছেলে কালী উত্তরপ্রদেশের সরকারী হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক সংস্থার ডিভিশন্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ঠাকুরমাকে পরমেশ্বরী করে সংসারে রাখতে আগ্রহী; কিন্তু বৃদ্ধা তাতে রাজী নন। রাণীদির দেবর এই শান্তিময় আশ্রয় ছেড়ে আর কোথাও থাকতে চান না। এই গঙ্গার তীর এবং বিশ্বনাথের ঠাঁই-ই তাঁর পরম আকাঙ্ক্ষিত। তাই রাণীদির হরিশ্চন্দ্র ঘাটের সংলগ্ন বাড়িটি পিসিমার কল্যাণে 'এসোজন বসোজনের' ভিড়ে সর্বদাই কলমুখরিত থাকত।

রাণীদির দেবর চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাশী পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। মধ্যবিত্তের আয় কিন্তু প্রাণ-প্রাচুর্যে ঐশ্বর্যান্বিত।

দুই স্ত্রী। প্রথমার গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় প্রথমা স্ত্রী নিজেই জোর করে স্বামীর আবার বিবাহ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীরও কোন পুত্র-কন্যা হল না। কিন্তু দুই সতীনের কি মিল আর সদ্ভাব; আর স্বামী ভক্তি! একেলে সুশিক্ষিতা মেয়ে আমার গৃহিণী বিবাহের পর একবার এখানে এসে দুই সতীনের সংসার দেখে বিমুগ্ধ এবং

বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই আর এখন ইহ-জগতে নেই ;—একমাত্র আমার রাণীদি ছাড়া। তাই এখন আর কাশী এলে ও-বাড়িতে উঠতে মন চায় না।

রাণীদি এখন কাশীতে আছেন কি নেই—সে-খবর এবার নিইনি ; আর নিইনি এই কারণে যে এবারের যাত্রায় আমরা দুটি পরিবার একত্রে আছি দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একটি হোটেলের আশ্রয়ে।

কখন জানিনে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে এসে পৌঁছে গেছি। নৌকো থেকে নেমে ঘাটে এসে বসলাম। গোধূলি-অন্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। হরিশ্চন্দ্র শ্মশানে একটি চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

অমাবস্যার রাত নয়, অন্ধকারও নয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা।

কিশোর কালে দেখেছিলাম হরিশ্চন্দ্র যাত্রাভিনয়। তখন আমরা উত্তর কলকাতা শ্যামবাজার পল্লীতে বসবাস করি। কম্বুলিয়াটোলা রামচন্দ্র মৈত্র লেনে। সেই পাড়ায় তখন নটরাজ নাট্যকার অমৃতলাল বসু থাকতেন।

তাঁর কথা যাক।

শ্যামবাজার অঞ্চলের রামচন্দ্র মৈত্র লেনে ছিল 'বেদান্ত প্রেস।' শ্যাম পণ্ডিতের পুত্রদ্বয় তার মালিক। পরবর্তী কালে শ্যাম পণ্ডিতের কাছে আমরা পড়েছি। উত্তর কলকাতার বিখ্যাত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় 'সরস্বতী ইনস্‌টিটিউশন'—প্রখ্যাত ইংরেজি ভাষার শিক্ষাবিদ স্বর্গত শৈলেন সরকার প্রতিষ্ঠিত। শৈলেন সরকার ইংরেজি ফার্স্ট বুক প্রণেতা প্যারীচরণ সরকারের পুত্র। সরস্বতী ইনস্‌টিটিউশন বর্তমানে শৈলেন সরকার স্মৃতিনামে বিভূষিত। শ্যাম পণ্ডিত এই বিদ্যায়তনের সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন।

বেদান্ত প্রেসের মাঠে আমরা পাড়ার ছেলেরা খেলতাম—আড্ডা দিতাম। শ্যাম পণ্ডিতের পুত্রদ্বয় নাট্য-অভিনয়ে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যাত্রাভিনয় দেখেছিলাম—বেদান্ত প্রেসের মাঠে।

সে কী সাড়ম্বর যাত্রানুষ্ঠান! এ্যামেচার পার্টি; কিন্তু অভিনয়ে সকল সৌখিন অভিনেতাই বিশেষ পারদর্শী।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মধ্য কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী ভীম নাগ পরিবারের অন্যতম সন্তান মানিক নাগমশায়। মানিক নাগমশায় এখন আর ইহজগতে নেই। তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী অনেকেই অবিদিত আছেন। সুপুরুষ সুঠাম তরুণ যুবক মানিক নাগ 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের' নাম ভূমিকায় যাত্রার আসর মাৎ করেছিলেন। তাঁর অনবদ্য-অভিনয় কুশলতার কথা আজো আমার মনোশ্চক্ষে প্রতিভাত।

কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের এই মহাশ্মশান। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর যথাসর্বস্ব দান করেও ঋষি বিশ্বামিত্রের ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি ক্রীতদাস আর তাঁর মহারাণী ক্রীতদাসী হয়ে সে ঋণ শোধ করলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীর শ্মশান ঘাটে এক ডোমের নোকর। আর রাণী শৈব্যা আর এক সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের দাসী। তাঁদের একমাত্র পুত্র সর্পাঘাতে হত। শৈব্যা এসেছেন মৃত পুত্রের দাহ-কার্যে শ্মশানঘাটে। দাহ খরচ চাই, কিন্তু সর্বরিক্তা ক্রীতদাসী কোথায় পাবেন সে কড়ি? ক্রীতদাসই বা তা ছাড়বেন কেমন করে?

ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে শ্মশানঘাট অন্ধকারাচ্ছন্ন। কিন্তু, কিন্তু কার কণ্ঠস্বর? ক্ষণ বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভায় শ্মশানের ডোম-পরিচারক কার মুখচ্ছবি দেখেন।

'বিদ্যুৎ তুমি আর একবার চমকাও! আমায় দেখতে দাও, দেখতে দাও কে এই রমণী!' মানিক নাগের রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকায় এই অভিনয় ভোলা যায় না। আর ভোলা যায় না ডোমের ভূমিকায় উচ্চারিত সেই কণ্ঠস্বর—'আরে এ টহলাকা মাতারি, তু দেখ্ যা, দেখ্ যারে—হামার হরিয়া রাজারে।'

হরিশ্চন্দ্র ঘাটে এলেই পুরাণের ইতিবৃত্তের সেই ছবি আমার

চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। এবারও তা প্রজ্জ্বলিত হল। আর আশ্চর্যের কথা—আজকের গোধূলি লগ্নে দশাশ্বমেধ ঘাটের চত্বরে সেই বৃদ্ধা সঙ্গীত-পসারিণীর মীরার ভজন গান শুনতে শুনতে যে নামটি কিছুতেই মনে আসছিল না হঠাৎ কেমন করে সেই নামটি আমার স্মরণপথে উদিত হল—ইউরেকা! ইউরেকা!! লোকনাথের বোন পদ্মিনী। পদ্মিনীদিকে চিনতে পারলাম যেন বৃদ্ধা গায়িকা কণ্ঠে গীত মীড় মূর্চ্ছনায় ; পদ্মিনীদির কণ্ঠ-আর্তি কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

'মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর!'

এ গান তো অনেকবার অনেক গায়ক-গায়িকার কণ্ঠে শুনেছি ; কিন্তু এমন সূক্ষ্ম সুরতান—শুধু পদ্মিনীদির কণ্ঠেই মূর্চ্ছনাহত হয়ে উঠত।

গান থামিয়ে পদ্মিনীদি অশ্রু-সজল চোখে তাকাতেন আমার মুখের দিকে। একঠোঙা খাবার দিয়ে বলতেন, 'যাও ভাই, বাড়ি যাও, পড়াশুনো করে মানুষের মতন মানুষ হও। এতক্ষণ এ-পল্লীতে তোমাদের থাকতে নেই, আর ছিঃ, এ-সব পাড়ায় তুমি আস কেন?'

পদ্মিনীদিকে কেন তবুও ভরসা করে বলতে পারিনে, 'দিদি, একটু একটু বুঝতে পারি বৈকি! এটা ভদ্র গেরস্থ পাড়া নয়—আর এখানকার লোকজন সব ভদ্র সভ্যও নয়। তুমি—তুমিও নও পদ্মিনীদি। কিন্তু কেন তুমি এ-পথে এলে? আমি যে তোমার টানেই এখানে রোজ ছুটে আসি।' কিছুই বলতে পারিনে। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক শুধু মাথা হেঁট করে উত্তর কলকাতার এক অতি কুখ্যাত বারবণিতা পল্লী থেকে সন্ধ্যার মিটমিটে গ্যাসের আলোয় খাবারের ঠোঙাটা হাতে করে শহরের রাজপথে এসে বাড়ির দিকে পা বাড়াতাম।

শুধু মীরার ভজন নয়—পদ্মিনীদি আরো কত রকমের সব গান গাইতেন—পায়ে ঘুঙুর বেঁধে রাধিকা-নৃত্য নাচতেন। কণ্ঠে সুরায়িত

হয়ে উঠত মহাজন বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষণ অভিসারের পদ মাধুরী কখনো বা—

'কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মন্দিরচীর হি ঝাঁপি।'

কিন্তু লুকিয়ে চুরিয়ে যে নাচের মহড়া দেখেছি তাতে লোকনাথের সহপাঠী আমাদের ক্লাশের নেতা কানাই ঘড়ুই বিশেষ পুলকিত হত। আমার কিন্তু মন সংকুচিত হয়ে উঠত—পদ্মিনীদি এমন অসভ্য নাচ নাচেন কেন?

নাচের মহড়া চলত বিকেলে। স্কুলের ছুটির পর যেদিন কোচিং ক্লাশ নেই—সেদিন আমরা সোৎসাহে লোকনাথদের বাড়িতেই ছুটতাম। আমরা কয়েকজন মাত্র—লোকনাথের যারা বিশেষ বন্ধু এবং আমাদের নেতা কানাই ঘড়ুই। চিৎপুর রোডে শোভাবাজার অঞ্চলে কানাই ঘড়ুই-এর পিতৃদেবের ছোট্ট একখানা কাপড়-গামছার দোকান। কিছু লেখাপড়া শিখে হিসেব-নিকেসে দক্ষ হয়ে কানাই নাকি বাপের দোকানেই বসবে।

কানাই-এর মুখ আল্‌গা—পান জর্দার সঙ্গে ট্যাটলার সিগরেট খায়। আমাদের চেয়ে বয়েসে চার পাঁচবছর বড়—অর্থাৎ আসন্ন যৌবন-রসে অভিষিক্ত তারুণ্য তার দেহ-মনে।

পদ্মিনীদি তাকে দেখতে পারতেন না—প্রায়ই তিরস্কার করতেন। কিন্তু কানাই মাতৃ-সম্বোধনে লোকনাথের মাকে বশ করে ফেলেছে।

শনিবারের এক দ্বিপ্রহর। ইস্কুলের এ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে কানাই-এর সঙ্গে দেখা। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিটের এক কুখ্যাত পল্লীতে লোকনাথদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম দুজনে প্রায় নিঃশব্দে। পূর্বতন নোতুন বাজারের সন্নিকটস্থ বাড়ি পরিবর্তন করে লোকনাথের বাবা সোনাগাছি পল্লীর দোতলায় পুরো অংশটাই ভাড়া নিয়েছেন। লোকনাথদের ঐশ্বর্য এখন বেড়ে গেছে।

এ-বাড়ির একতলায় ঢুকতেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল। একরাশ এঁটো বাসন পত্তর উঠোনের চত্বরে। মাংসের হাড় আর মাছের কাঁটা

নিয়ে কাক আর বিড়ালের লড়াই চলছে। উঠোন সংলগ্ন ছোট ছোট অন্ধকার-ঘরের অধিবাসিনীরা অত্যন্ত অসংলগ্ন বেশ-ভূষায় শুয়ে-বসে। দু'চারটে ইতর-কথাবার্তা কানে এল।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে সামনের বড় ঘরখানিতে দেখলাম ফরাশ-পাতা। এখানে ওখানে মদের বোতল এবং পান-পাত্র।

সঙ্গীত নৃত্যের আসর ঘিরে কয়েকজন যুবক এবং বয়স্ক পান পাত্রে থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে। হারমোনিয়ম বাজছে—ডুগি তবলায় চাঁটি পড়ছে। গানের সঙ্গে নাচ। ঘুঙুর পায়ে বার-বিলাসিনী পদ্মিনীদির এ-ধরনের গানে এ ধরনের নাচ এর আগে আর কোনদিন দেখিনি।

গান চলছে। বয়সে বড়, মাথায় কাঁচা-পাকা বাবড়ি চুল, ব্যাটার ফ্লাই গোঁফ, গায়ে সুচিক্কন আদ্দির পাঞ্জাবী। গিলেকরা পাঞ্জাবীর একহাতে স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়ামের বেলো আর একহাতের আঙুল-গুলি দ্রুতগতিতে হারমোনিয়ামের রীডগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। সে কী গান—

আহা মরি! বেশ তো ভালোবেসেছো।

বেশ বেশ বেশ বশ করেছো রাখতে ভালো শিখিয়েছো।'

ফুলকাটা সিল্কের পাঞ্জাবী গায়ে তরুণ নৃত্য শিক্ষক খেমটা-নাচের ছন্দ গুনছে—এক, দুই, তিন—

'আহা বেশ! বেশ!! বেশ!!!

অশ্লীল অঙ্গ ভঙ্গি করে পদ্মিনীদি খেমটা নাচ নাচছিলেন। আমার দিকে চোখ পড়তেই নাচ থামিয়ে অসংলগ্ন বেশ-ভূষায় স্খলিত পদে ঘরের দরজায় বাইরে এগিয়ে এসে চিৎকার করে উঠলেন,—'বেরোও বেরোও, শিগ্‌গীর বেরিয়ে যাও এ-বাড়ি থেকে। ফের যদি দেখি-এ বাড়িতে এসেছো ঠেঙিয়ে পা-খোঁড়া করে দেব।'

নিমেষে গীত-নৃত্য আসরের রসভঙ্গ হল।

আমি ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একেবারে সদর রাস্তায় এসে পৌছালাম। কানাই ঘড়ুই এর খবর আর জানিনে।

বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ঘৃত ব্যবসায়ী দেবেন দত্তমশাই রাসভারি লোক ছিলেন। রাজা গুরুদাস স্ট্রিটের তিনমহল বাড়ি জুড়ে তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র কন্যা খুবই অমায়িক এবং মিষ্টস্বভাবের। দত্তগৃহিণী কত রকমের মিষ্টি খাবার স্বহস্তে তৈরী করে খাওয়াতেন আমাদের। আমরা ছিলাম প্রকৃতই তাঁর আপনজনের মতন। তাঁদের অমায়িক ব্যবহারেই মা এ-বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে এই বিশ্রী পল্লী থেকে ভদ্রপল্লীতে উঠে যাওয়ার আশু প্রয়োজনীয়তার কথা কয়েক বছরের জন্যে স্থগিদ রাখলেন।

মায়ের ইচ্ছা ছিল আমাদের দু'ভাইকে আহিরীটোলার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ইস্কুলে ভর্তি করানো।

দত্তমশাই-এর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথদা কিন্তু অন্য কথা বললেন, 'কোম্পানি বাগানের কাছে শ্যামাচরণ ইন্সটিটিউশন বাড়ির আরো অনেক কাছের ইস্কুল। আর সে-ইস্কুলের সত্বাধিকারী ইংরেজি ভাষার শিক্ষক জ্ঞানবাবু—ছাত্র বৎসল, ভারি যত্ন নিয়ে ছাত্রদের দেখা-শুনা করেন। এমন কী বিনা বেতনে ইস্কুলের ছুটির পরে আলাদা কোচিং ক্লাশও করেন।'

বিশ্বনাথদার কথা শুনেও মা কিন্তু খুঁৎখুঁৎ করছিলেন। বাবা রাজি হয়ে গেলেন—'তাহলে বিশ্বনাথ, তুমি ওখানেই ওদের ভর্তি করে দাও। ইস্কুলের মাইনে গুনে আবার বাড়িতে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আলাদা টাকা খরচ করে প্রাইভেট টিউটর রাখি, এমন আর্থিক স্বচ্ছন্দতা আমার নেই।'

আমি আর ছোড়দা গেলাম—শ্যামাচরণ ইন্‌স্‌টিটিউশনে কোম্পানি বাগানের পশ্চিমের রাস্তায় হলদে রঙের তিনতলা ইস্কুল বাড়ি।

বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত চিৎপুর সংলগ্ন রবীন্দ্র-কাননকে তখনকার দিনে কোম্পানি বাগান বলা হত। আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র

কয়েক মিনিটের পথ।

আমরা চার সহোদর। বড় ভাই গোবরডাঙ্গায় নিঃসন্তান ডাক্তার বাবুর কাছে পুত্রবৎ লালিত-পালিত এবং শিক্ষিত হয়ে উঠছেন।

মেজ ভাই বাল্যাবধি অত্যন্ত দুরন্ত স্বভাবের। কলকাতায় রাখা নিরাপদ নয়, যেহেতু পিতৃদেবের ছেলেদের প্রতি নজর রাখার সময় নেই—এমনই ব্যবসায়ের কাজ। মেজদা গেলেন বর্ধমানে—আমার ছোট ঠাকুরদার বাড়িতে। তিনি ধর্মশীল এবং সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তি। আমার আপন ঠাকুরদা অকালে পরলোক গমন করায় ভাইপোদের তিনিই মানুষ করেছিলেন। নাতিদের মধ্যে চঞ্চল-স্বভাবের মেজদাকে তিনিই তাঁর আশ্রয়ে ডেকে পাঠালেন। চব্বিশ পরগণা আলিপুর কোর্টের রেকর্ডকীপারের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি তদানীন্তন বর্ধমান রাজ স্টেটের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারি। স্বর্গত রাজা বনবিহারী কাপুরের আস্থাভাজন ধর্মপ্রাণ ন্যায়বান বিশ্বস্ত সম্ভ্রান্ত কর্মচারি তিনি।

আমি আর ছোড়দা থাকি কলকাতায় বাপ-মায়ের কর্তৃত্বাধীনে।

ছোড়দা স্বভাবসিদ্ধ শান্ত সুশীল, লেখা-পড়ায় মনোযোগী। জ্ঞানবাবুর ইস্কুলের কোচিং দরকার ছিল না ছোড়দার জন্যে। আমি তার বিপরীতধর্মী।

জ্ঞানবাবুর কোচিং প্রকৃত পক্ষে একটা আড্ডাখানা হয়ে উঠল আমাদের। কানাই ঘড়ুই সর্দারের শিষ্য হয়ে আমরা ক'জন জাহান্নমের পথেই এগিয়ে চলেছিলাম। লোকনাথ আমাদেরই মধ্যে একজন সুদর্শন বালক—হাসিখুশিতে চাঞ্চল্যে প্রাণবান কিশোর। লোকনাথ আমাকে আকর্ষণ করল।

লোকনাথের সঙ্গে প্রথম যেদিন গেলাম তাদের নোতুন বাজারের সন্নিকটস্থ একটি সরু গলির বাড়িতে তখন সে-পল্লী-সম্পর্কে তেমন অবহিত হই নি। সেদিন লোকনাথের বাবা, মা, আর দুই বোনকেই দেখেছিলাম। লোকনাথ একটি মাত্র পুত্রসন্তান। লোকনাথের

ছোট বোন তখন অপ্রাপ্তবয়স্কা। আর লোকনাথের দিদি পদ্মিনী সত্যিই রূপে-গুণে, আদরে-স্নেহে সবচেয়ে আমার আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্যামাচরণ ইন্‌স্‌টিউশনের স্কুলের প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েছিলাম। যে-গানে লোকনাথ রীতিমত আকৃষ্ট হয়েই তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল—'জানিস্, দিদি খুব ভাল গান করে। তোর গান শুনলে খুব খুশি হবে, দেখিস্।'

সত্যিই লোকনাথের দিদির অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। দশ বছরেরর বালককণ্ঠে গাইলাম—

'বাকি কি রেখেছ দিতে, ওহে করুণার আধার,
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ, ক্ষুধার ভাণ্ডার।'

এ গান ভক্তিমার্গের গান। দশ বছরের ছেলে এ গানের মর্মার্থ বুঝিনে; কিন্তু তবুও এ গান গাইতে গাইতে গলা কেঁপে গিয়েছিল, চোখ ছলছল করে উঠেছিল।

লোকনাথের দিদি কি বুঝেছিলেন জানি নে। মৃদু হেসে আমার গানের তারিফ করেছিলেন।

তাঁর কণ্ঠের গানের সুরের সূক্ষ্ম কাজ অনুধাবন করার বয়েস আমার হয় নি, কিন্তু স্বরের মাধুর্য আর মিষ্টত্ব আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল।

সেদিনই বলেছিলাম, 'পদ্মিনীদি, আমাকে গান শেখাবেন?'

পদ্মিনী বলেছিলেন, 'আগে গান নয়, গলা সাধ। রোজ সকাল-সন্ধ্যে রেওয়াজ করবে।'

'কেমন করে করব? বাড়িতে পড়াশুনা না করে গান গাইলে কি আর রক্ষে আছে?'

সত্যিই তাই। আমাদের অভিভাবক গান বুঝতেন না। তবু দেশে গেলে ডাক্তারবাবু গান গাইতে বলতেন। গান শিখতাম আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে।

পদ্মিনীদি কয়েকখানি ভালো ভক্তি-সঙ্গীত শিখিয়েছিলেন আমায়। কিন্তু তাঁর কণ্ঠে যেদিন মীরার ভজন শুনলাম সেদিন গানের আর এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান পেলাম।

সে-গান আমি শিখতে পারি নি—অপটু কণ্ঠে মীরাবাঈ এর আকুতি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব।

বছর খানেক বাদে পদ্মিনীদিদিদের বাড়ির আসল পরিচয় বুঝতে শিখলাম। এ-বিষয়ে আমার সহপাঠীবন্ধু কানাই ঘড়ুই সবিশেষ জ্ঞানদাতা।

মনে ব্যথা পেয়েছিলাম—'পদ্মিনীদি কেন এমন হলেন? প্রকৃত পক্ষে তাঁরও তো বাপ, মা, ভাইবোন আছে। তবে?'

এ-ভবের উত্তর জানার আগেই পদ্মিনীদির কাছ থেকে বিদায় নিতে হল সেদিন শনিবারের মধ্যাহ্নে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। মনের দুঃখে লোকনাথের সঙ্গও চিরদিনের জন্যে ছেড়ে ছিলাম। আর সে সুযোগও এল আমার জীবনে।

শ্যামাচরণ ইনস্‌টিটিউশন থেকেও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে অন্য ইস্কুলে ভর্তি করালেন আমার অভিভাবক পিতৃদেব। মায়ের চোখে আমার চাল-চলন ভালো ঠেকেনি।

বাসা বদলও হয়েছে ইতিমধ্যে। বিডন স্ট্রিটের সংলগ্ন রাজা গুরুদাস স্ট্রিট থেকে আমরা চলে এলাম শ্যামবাজারে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ঘাট থেকে সাইকেল রিকসায় যখন আবার দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে পৌছালাম—তখন আর বৃদ্ধা গায়িকাকে খুঁজে পেলাম না।

কিন্তু তার কণ্ঠের মীরাবাঈ-এর গানের আর্তি আমাকে আবার বিহ্বল করে তুললো। কে এই বৃদ্ধা রমণী? এতদিন বাদে গানের মধ্য দিয়ে এমন সুস্পষ্ট অতীত কেন আমাকে উতরোল করে তোলে?

রাত তখনো বেশি হয়নি। গঙ্গার ঘাটে তখনো ভিড়—নৌকা

চলাচল করছে।

বৃদ্ধা গায়িকা নেই, কিন্তু গানের রেশ থেমে যায় নি।

সে গানের সুর ভাসছে জাহ্নবীর ঢেউ এর দোলায়। সেই কত-কাল আগের শোনা গানের সকরুণ মূর্ছনা।

'মীরাকে প্রভু, গিরিধারী নাগর!'

গানটি কিছুতেই আমি পদ্মিনীদির কাছ থেকে নিজকণ্ঠে তুলে নিতে সক্ষম হইনি। বহুকাল গানের চর্চা ছেড়েও দিয়েছি। কিন্তু তবু কেন কণ্ঠ আজ আপনা থেকেই গুনগুনিয়ে ওঠে!

আর বৃদ্ধা গায়িকার পরিচয় লাভের জন্যে মনেই বা কেন এমন ব্যাকুলতা জাগে?

ঘাটের চত্বরে দু'চারজন পসারি তখনো দোকান মেলে বসে আছে। একজনের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয়ও ঘটেছে।

বৃদ্ধা গায়িকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় দোকানি উত্তর দিলে—'ও কলকাতার এক নামকরা বাঈজী, যৌবন খুইয়ে বার্ধক্যে পৌছে এসেছে কাশীতে। বাবা বিশ্বনাথের করুণাশ্রয়ই এখন সম্বল। মাঝে মাঝে এই ঘাটে এসে গান করে—এই এখন উপজীবিকা ওর।'

বললাম, 'কোথায় থাকে এখানে?'

'তা বাবু জানিনে। শুনেছি রূপ আর নাচ-গান যাচিয়ে অনেক অনেক পয়সা করেছিল। সব গেছে বাবু, সব গেছে। এমনি করেই সব যায়—এই তো নিয়ম!'

দোকানির কথায় জীবন-দর্শনের এক ইঙ্গিত পেলাম যেন—'সবই যায়—এই নিয়ম।'

কিন্তু কিছুই কী থাকে না? বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতির রেশ, আশ্বিনের ঝরে পড়া শিউলির কিছু মৃদু সুবাস, বয়ে যাওয়া দক্ষিণের বাতাসের কিছু আবেশ—ক্ষণকালের জন্যেও তো বিগত পরমায়ুকে ফিরিয়ে আনে।

'বাবা বিশ্বনাথ, কৃপা কর বাবা।'

আরেক বৃদ্ধা রমণী সামনে এসে হাত মেলে দাঁড়ালো।—'কেউ নেই বাবা, শুধু বিশ্বনাথই সম্বল।'

পকেট থেকে একটি টাকাই বের হয়ে এলো। বৃদ্ধার হাতে দিলাম।

চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল বৃদ্ধার, 'রাজা হও বাবা। সুখী হও বাবা। বড় কষ্ট বাবা।'

'কেন, কেউ কি তোমার নেই?'

'আছে বৈকি বাবা,—নিশ্চয়ই আছে। বাবা বিশ্বনাথ আছেন, তাঁর কৃপা আছে। তা না হলে তোমাদের মতন দাতার দর্শন মেলে কোথেকে?'

বৃদ্ধার কথায় চমকে উঠলাম আমি—বাবা বিশ্বনাথ আছেন। আছে কত কত দীন দুঃখী, পাপী-তাপী তাঁর চরণাশ্রিত হয়ে।

'হর হর ব্যোম ব্যোম—জয় বাবা বিশ্বনাথ!'

কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে যাত্রীর দল।

হঠাৎ সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে এক প্রার্থনার সুর আমার কণ্ঠ হতে নিবেদিত হল,—'বাবা বিশ্বনাথ, পদ্মিনীদিকে তুমি আশ্রয় দিও!'